গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর মুখপত্র

অধিকার

সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিনিময় : ১৫ টাকা

এই সংখ্যায় রয়েছে—

- মর্মান্তিক ! / পৃ. ২
- মণিপুর ও আমাদের অঙ্গীকার / পৃ. ৩
- স্কুল শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ / পৃ. ৫
- আমার ভারত ওদের ভাষ্য (৩য়) / পৃ. ৭
- বিএসএনএল ধ্বংসের পথে/ পৃ. ৮
- সনৎ রায়চৌধুরীর জীবনাবসান / পৃ. ৯
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ১২-১৫
- সংগঠন রিপোর্ট / পৃ.১৫-২৩
- সার্বভৌম বনাম ভারত রাষ্ট্র / পৃ. ২৪
- নজরকাড়া সংবাদ—

ভাবো ভাবো, ভাবা অভ্যাস করো /পৃ.২৫

গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষা সংগঠন, ওড়িষা প্রেস রিলিজ / পৃ. ২৬

- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের মৃত্যু— কিছু কথা / পৃ. ২৮
- স্মরণ—

ডাঃ স্থবির দাশগুপ্ত ও শ্রীকৃষ্ণ পাল / পৃ. ৩২

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : রঞ্জিত শূর (8017437302)
কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

সম্পাদকীয়

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ১১ই আগস্ট, ২০২৩-এ হঠাৎ সংসদে তিনটি বিল পেশ করলেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিল, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বিল এবং ভারতীয় সাক্ষ্য বিল। বলা হলো আইপিসি সিআরপিসি এবং এভিডেন্স অ্যাক্ট বাতিল করা হবে। এবং প্রস্তাবিত বিলগুলি আইনে পরিণত করে আইপিসি, সিআরপিসি এবং এভিডেন্স অ্যাক্টের জায়গা নেবে। বস্তুতপক্ষে এটি কার্যকরী হলে স্বাধীন ভারতে আইনের জগতে এটিই হবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। যুক্তি হিসেবে বলা হল দাসত্বের চিহ্নগুলো সব মুছে দেওয়া হবে।

পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিলগুলোর নাম নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। এ দেশে আইনের নাম সাধারণত ইংরেজি ভাষায় হয়। হঠাৎ হিন্দিতে কেন? এর প্রতিবাদ করে সঠিকভাবেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে বলা হল, এটা সারাদেশে আরএসএসের হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার যে প্রকল্প তারই অংশ হিসেবে করা হচ্ছে। দাবি উঠলো পরিবর্তনের।

একটা গুরুত্বপূর্ণ আইন বা কোন আইনের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনতে গেলেও দীর্ঘদিন ধরে তার গণচর্চা দরকার। স্বচ্ছতা দরকার। নাগরিকদের মতামত নেওয়া দরকার। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নেওয়া দরকার। কিন্তু এত বড় পরিবর্তন— ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা খোলনলচে বদলে দেওয়ার চেষ্টা কার্যত কোন ধরনের গণচর্চা ছাড়াই বিল আকারে সংসদে পেশ করা হলো। ফলত তাড়াহুড়ো করে সরকারের এই আইন পরিবর্তনের চেষ্টাকে খুব সন্দেহজনক বলে প্রতিবাদ হতে থাকলো।

প্রস্তাবিত আইনে রাষ্ট্রদ্রোহ বা সিডিশনকে বাতিল বলে ঘোষণা করলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু দেখা গেল, সিডিশন বাতিল হলেও আইনের মধ্যে কার্যত সিডিশন কে আরও কঠোর, আরও বিস্তৃত করেই নিয়ে আসা হয়েছে। অনেক অস্পষ্ট শব্দ বিলের ভাষার মধ্যে রাখা হয়েছে, যার ফলে কার্যক্ষেত্রে পুলিশের হাতে ক্ষমতা অনেক বেশি ন্যস্ত হবে। 'সন্ত্রাসবাদ' এই প্রথম ভারতের মূল ফৌজদারি আইনের মধ্যে নিয়ে আসা হলো। এতদিন 'সন্ত্রাস দমনের জন্য'

ইউএপিএ 'র মত আলাদা আইন করা হতো। সন্ত্রাসবাদের একটা সংজ্ঞাও নির্ধারণ করা হলো। মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আশঙ্কা, সুযোগ অনেক বাড়ানো হলো। পুলিশ হেফাজতে রাখার সময় ১৫ দিন থেকে বাড়িয়ে ৬০ বা ৯০ দিন করা হলো।

বিচারের গোটা পর্যায়ে বন্দীকে ভিডিওতে হাজির করার সুযোগ রাখা হলো। কোন অভিযুক্ত পলাতক হলে তার অনুপস্থিতেই বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। অর্থাৎ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে না।

ভারতের বিচার ব্যবস্থার দর্শন হল যতদিন পর্যন্ত-না কেউ বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয় ততদিন পর্যন্ত সে নির্দোষ। কিন্তু প্রস্তাবিত নাগরিক সুরক্ষা সংহতিতে (সিআরপিসি) বলা হয়েছে, বিচার চলাকালীনই অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে সরকার। সকল অভিযুক্তের নাম-ঠিকানা পরিচয় জনসমক্ষ্যে রাখা হবে।

সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইলেকট্রনিক/ভিডিও সাক্ষ্যের উপরে। এরকম বহু ধারা নিয়ে মানবাধিকার কর্মীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। সামগ্রিকভাবে সরকার এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাই বলুক-না কেন এটা খুবই পরিষ্কার এ আইন নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ সংকুচিত করবে। পুলিশের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বাড়াবে। গণতান্ত্রিক পরিসর আরও সংকুচিত করবে। তাই এই বিলগুলোকে আইনে পরিণত হওয়ার আগেই অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া জরুরী। আরও অনেক সময় নিয়ে ব্যাপক গণচর্চার মাধ্যমে, সমস্ত রাজনৈতিক দল, বিচার ব্যবস্থা, জনসাধারণ, সবার মতামত নিয়ে সংশোধন করে ফের এই বিল আনা হোক। আপাতত তিনটে বিলই প্রত্যাহার করা হোক।

মর্মান্তিক!

বিশেষ প্রতিবেদন

গত ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সন্ধ্যা ছ'টায় দার্জিলিং-এর এক প্রাইভেট স্কুলের মাত্র পনেরো বছরের এক নবম শ্রেণির ছাত্র গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তার বাড়ি এবং প্রতিবেশীদের অভিযোগ স্কুলে Raffel টিকিট সংক্রান্ত প্রবল চাপই তাকে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছে। গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে পাহাড়ে প্রাইভেট শিক্ষায়তনগুলিতে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উন্নতিকল্পে বা অন্য কোন অজুহাতে ছাত্রদের হাতে বেশ কয়েকটি করে কুড়ি থেকে পঞ্চাশটি পাতাসহ লটারির টিকিট বা কুপন সম্বলিত বই ধরিয়ে দেওয়া হয়। কুপন হয় ২০ বা ৫০ টাকার। একটি Raffel sheet-এ ২০ থেকে ৫০টি টিকিট থাকে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এই বিলের সম্পূর্ণ মূল্য সংগ্রহ করে আনার জন্য ছাত্রদের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে। ছাত্ররা পুরো কালেকশন না ওঠা পর্যন্ত অপমান বা শাস্তির ভয়ে স্কুলে যেতে চায় না। ছাত্রদের ওপর দেওয়া চাপ পরোক্ষভাবে এসে পড়ে বাবা মা'র ওপর। তারা কুপনগুলোর টাকা নিজের পকেট থেকে দিয়ে দায়মুক্ত ও চাপমুক্ত হতে চান। ''....যাদের বাড়ির একাধিক ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় তাদের ক্ষেত্রে অবস্থা সামাল দেওয়া দুর্বিষহ হয়ে পড়ে!''—জনৈক অভিভাবকের এই কথা এক মর্মান্তিক সামাজিক জোরাজুরির প্রশ্ন হাজির করে।

বেশিরভাগ পাহাড়ি স্কুলগুলো দশেরা থেকে দেওয়ালি এই সময়টায় ছাত্রদের হাতে লটারির বই ধরিয়ে দেন কারণ, এই সময় সবাই উৎসবের মেজাজে থাকেন। তবে Raffel এখন অন্যসময়ও চাপানো হয়।

হতভাগ্য বালকটি তিনটি কুপন শেষ করেছিল। বাকিটা শেষ করতে পারেনি। তাকে স্কুলে তীব্র ভর্ৎসনা করা হয়েছিল। সে মনমরা হয়ে থাকছিল। স্কুলে যেতে চাইছিল না।

''এমন-কী টাকা না দিতে পারায় ক'দিন আগে আমার ভাইকে সব ছাত্রের জমায়েত (School Assembly) থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল''—নিহত ছাত্রের দাদার অভিযোগ। তাকে পুরো কোটা শেষ করবার জন্য ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছিল।

স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য কাম্য সুরেই জানিয়েছেন যে তারা কখনোই সবক'টি কুপন বই শেষ করবার জন্য কোন ছাত্রকেই চাপ দেননি। হ্যাঁ, কিছু ছাত্রকে অবশ্যই Assembly-এর বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁরা, ''...had pulled out students who had not sold the tickets in the Assembly just to keep count "several days ago". খবরে প্রকাশ, পুলিশ স্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে গ্রেপ্তার করেছে এবং দার্জিলিঙের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত তাকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের আদেশ দিয়েছেন।

— বাকি অংশ ৩১ পাতায়

মণিপুর ও আমাদের অঙ্গীকার

অজেয় পাঠক

"মণিপুর নিয়ে কবিতা লিখছি,
ব্যর্থ কবিতা! ব্যর্থ কলম!''

— জয় গোস্বামী

সত্যি, লিখে আর কিছু হবে? ২০০ মানুষের মৃত্যু, ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষের উৎখাত হওয়া, ৪ হাজার বাড়ি ও ৩৩০ টি ধর্মস্থান জ্বালিয়ে দেওয়া, ৩৫০টি ত্রাণশিবিরে এখনও ৪০ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে কোনোক্রমে মাথা গুঁজে আশ্রয় নেওয়া,, মণিপুর নিয়ে এই সব কিছু জানা, পড়া, লেখা হয়ে গেছে। সারা দেশ দেখেছে, মুমূর্ষু রোগী সহ গোটা আম্বুল্যান্স জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে. মণিপুরে প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী চুড়াচাঁদ সিংহের ৮০ বছরের বৃদ্ধা স্ত্রী বিনোদেবীকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ১৯ জুলাই দুই নারীকে গণধর্ষণের পর নগ্ন করে দৌড় করানোর ভিডিও প্রকাশ্যে আসে, যদিও ঘটনাটি ৪ঠা মে-র। পরে জানা গেছে মণিপুরের পুলিশই নির্যাতিতাদের ধর্ষক বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে। ঐ ভিডিও ভাইরাল হওয়ার আগে অবধি, অর্থাৎ মণিপুরে হিংসা শুরু হওয়ার পর থেকে ৭৮ দিন পর্যন্ত পাষাণের মৌনতা নিয়ে নিরুত্তাপ ছিলেন এদেশের সাংবিধানিক প্রধান। অথচ উনি দুর্ঘটনায় একজন ক্রিকেটারের সামান্য চোট লাগা নিয়েও ট্যুইট করে থাকেন। ৭৯ দিন পরে বিশ্বগুরু প্রধানমন্ত্রী মণিপুর নিয়ে তাঁর মূল্যবান ২৬ সেকেন্ডের একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, যদিও সেটা দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবিষয়ে হস্তক্ষেপের হুমকি দেওয়ার পর। তারপর গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় পতাকা তোলার পর তিনি বলেছেন, ''মণিপুরের মানুষের সঙ্গে আছে এই দেশ। শান্তির মাধ্যমেই সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমাধানের সমস্ত পথ খুঁজছে।''

মণিপুর নিয়ে তাঁর এই দীর্ঘ মৌনতা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তিনি যে মতাদর্শের প্রচারক, সেই মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হিন্দুত্বের রাজনীতিই মণিপুরের জাতিদাঙ্গা সৃষ্টি করেছে এবং তাকে একটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করেছে। মণিপুরে ৫৩ শতাংশ মানুষ মেইতেই সম্প্রদায়ের এবং মাত্র ১৬ শতাংশ কুকি-জো জনজাতির। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দু ৪১ শতাংশ, খ্রিস্টানও ৪১ শতাংশ। মেইতেই সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ আছেন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের। পুড়িয়ে দেওয়া ৩৩০টি ধর্মস্থানের মধ্যে ২৪৯ চার্চই হল মেইতেই সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানদের। অর্থাৎ, মেইতেই-কুকি নয়, বরং হিন্দুত্ববাদী বনাম খ্রিস্টান সংখ্যালঘু দ্বন্দ্বটিই বড় হয়ে উঠেছে। যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, সে-রাজ্যে হিন্দুত্ববাদীদের লক্ষ্যবস্তু যে সংখ্যালঘু খ্রিস্টানরাই, সে-তো আমরা দেখেছি ঝাড়খণ্ডে; যখন সেখানে খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীদের অবাধে ধর্ষণ আর খুন করেছিল হিন্দুত্বের পূজারিরা। আমরা দেখেছি, ২০০৮ ওড়িশার কন্ধমালে ভয়াবহ ধর্ষণ আর গণহত্যা চালিয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ঘাতকেরা। আক্রান্ত হয়েছিল ৬০০টি খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রাম, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৫৬০০ বাড়ি, ৫৪ হাজার মানুষ হ'ন ঘরছাড়া, পোড়ানো হয় ২৩২ টি গির্জা, সরকারি মতে মৃত ৩৯ জন খ্রিস্টান ধর্মালম্বী। আজকের মণিপুরের সাথে কী মিল, তাই না! আজ, মণিপুর রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন-তো হিন্দুত্ববাদীরা।

একইভাবে, ১৯৯৮ সালে গুজরাটে ক্ষমতায় আসার পর সে-রাজ্যের দক্ষিণপূর্বের জেলা ডাঙ্গস-এ একটানা দশদিন সংখ্যালঘু আদিবাসী-খ্রিস্টান বিরোধী হিংসা চলে। এই ঘটনার চার বছর পর, ২০০২-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি গোধরাকাণ্ড পরবর্তী গুজরাটে কী-ভাবে মুসলিম সংখ্যালঘু নিধন আর নারীধর্ষণ হয়েছিল, তা' জানে সারা বিশ্ব। আসলে এটাই হিন্দুরাস্ট্র নির্মাতাদের দীর্ঘস্থায়ী, শৃঙ্খলাবদ্ধ গৈরিক পরিকল্পনার অঙ্গ। মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, দলিত, আদিবাসী সমেত প্রত্যেকটি অহিন্দু গোষ্ঠীকে নির্মূল করো। নিস্তার পাবে না সাম্যবাদী, গণতান্ত্রিক, মুক্তমনা মানুষেরাও (গৌরি লঙ্কেশ, ফাদার স্ট্যান স্বামী-র মত)। কোপ নামবে নারিমুক্তির প্রবক্তা, মানবাধিকার কর্মীদের উপরেও। এর পরেও যারা বেঁচে থাকবে তারা থাকবে সমস্ত অধিকারহীন ক্রীতদাসের মত। বিদ্রোহ করলেই ঠাঁই হবে ডিটেনশান শিবিরে, যা আসলে নাৎসি জার্মানির কন্সেন্ট্রেশান ক্যাম্প বা ইহুদী-কমিউনিস্ট নিধন শিবিরের ভারতীয় মডেল! এ-সবই রয়েছে হেডগেওয়ার-গোলওয়ালকর প্রবর্তিত সংঘ শিক্ষাক্রমে।

আর এস এসের মুখ্য তাত্ত্বিক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর তাঁর 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড' নামক বইতে অহিন্দু সংখ্যালঘুদের প্রতি এই নাৎসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত এই বইয়ে তিনি হিটলারের নাৎসি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রশংসা করে গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘুদের প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের মনোভাব তুলে ধরেছিলেন এই ভাবে, তএইসব প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি কিভাবে তাদের সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করেছে, তা' অবশ্যই মনে রাখতে হবে। নিজেদের রাষ্ট্রকাঠামোয় কোনও

পৃথক উপাদানকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়নি তারা। দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যা বা 'রাষ্ট্রীয় জাতি'র মধ্যে একাত্মীভূত হতে হয়েছে বহিরাগত অভিবাসীদের, গ্রহণ করতে হয়েছে তাদের সংস্কৃতি ও ভাষা, অংশীদার হতে হয়েছে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষায়, নিজেদের পৃথক অস্তিত্বের কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলতে হয়েছে, ভুলতে হয়েছে তাদের বিদেশি উৎসের কথা। তা' না-করলে নিছক বহিরাগত হিসেবেই থাকতে হবে তাদের, রাষ্ট্রের সমস্ত বিধিনিয়ম মেনে চলতে হবে, রাষ্ট্রের অধীনস্ত হয়ে থাকতে হবে, কোনও বিশেষ সুরক্ষা পাবে না, কোনও সুবিধা বা অধিকারের তো প্রশ্নই ওঠে না। বহিরাগতদের জন্য মাত্র দুটি পথই খোলা আছে , হয় রাষ্ট্রীয় জাতির সঙ্গে মিশে যেতে হবে এবং তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে, অথবা রাষ্ট্রীয় জাতি যতদিন চাইবে, ততদিন তাদের করুণার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা এবং রাষ্ট্রীয় জাতি যখনই চাইবে , তখনই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। সংখ্যালঘু সমস্যা সম্বন্ধে এটিই একমাত্র যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি। এটিই একমাত্র যৌক্তিক ও সঠিক সমাধান। নিজেদের রাষ্ট্রকাঠামোয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির মতো কর্কটরোগতুল্য বিপদ থেকে জাতিকে নিরাপদ রাখার এটাই একমাত্র উপায় ।ত (সুত্র, 'আর এস এসঃ একটি প্রাথমিক পরিচয়', লেখক, শামসুল ইসলাম, ভাষান্তর, অসীম চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক, বুকমার্ক)।

মণিপুর প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেণ সিংহ একাধিকবার কুকি জনজাতির মানুষকে 'বহিরাগত', 'অনুপ্রবেশকারী' আখ্যা দিয়েছেন। মণিপুরে জাতিদাঙ্গা ও গণহত্যা শুরু হওয়ার বহু আগেই মণিপুর সরকার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বেআইনি দখলদারি উৎখাত করার নামে বুলডোজার দিয়ে তিনটি ৫০ বছরেরও পুরণো গির্জা গুঁড়িয়ে দেয়।

তবে, শুধুমাত্র ধর্মীয় আধিপত্যবাদের আগ্রাসন দিয়ে আজকের মণিপুরের গণহিংসাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বরং এই হিংসার আরও একটি ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ আছে। বিশিষ্ট লেখিকা ও সমাজকর্মী অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর মণিপুর বিষয়ক প্রবন্ধ 'হিংসা, রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিকতা' প্রবন্ধে লিখেছেন— ''পূর্ব মণিপুরের জেলাগুলিতে সমীক্ষা করে ভারত সরকারের খনি মন্ত্রক ও জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া পেয়েছে বিরাট পরিমাণ খনিজের সন্ধান। লাইমস্টোন, ক্রোমাইট, তামা, নিকেল, ম্যাগনেটাইট, এমনকি প্লাটিনাম গ্রুপের মৌলও। কেবল লাইমস্টোন ও ক্রোমাইটের পরিমাণই আনুমানিক ২৬ মিলিয়ন টন। অনেক বেসরকারি সংস্থাকে লিজও দেওয়া হয়েছে সেই খনি, খনিজ উত্তোলনের জন্য। জনজাতির বসতি এই জেলাগুলিতে এ বার অরণ্য ও জমি থেকে উৎখাত হবেন আদিবাসীরা। ...জনজাতিদের অরণ্য থেকে উৎখাত করা সম্ভব হলে এই সব জমির মালিকানা হস্তান্তর করা যাবে। সমতলের মেইতেইদের যদি জনজাতি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে জঙ্গল-জমির হাতবদল সম্ভব হবে। এ সবই ভবিষ্যতের সঙ্কেত। কিন্তু এই সব কারণ ঘিরে যা ঘটেছে, তা রাষ্ট্রের মদতে জনজাতি বিতাড়ন। তাদের উপরে আক্রমণ। না হলে আক্রমণকারীদের হাতে এত লুট হওয়া বেআইনি অস্ত্র কী ভাবে এল?" (সুত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ জুলাই, ২০২৩) ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক সম্পদ কর্পোরেট-পুঁজিমালিকদের হাতে তুলে দেওয়া যে মণিপুরের পর্বতবাসী কুকি-জো জনজাতির উপর রাষ্ট্রীয় মদতে গণহিংসার অন্যতম কারণ তা অধিকার পত্রিকার পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত মণিপুর বিষয়ক নিবন্ধেও উল্লেখিত হয়েছিল।

আসলে, মণিপুরের গণহিংসা আর জাতিনিকেশে উভয়দিকেই লাভবান বর্তমান রাষ্ট্রশক্তি। প্রথমত, অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণায় জারিত হয়ে সমগ্র মণিপুরের জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সহজেই পদদলিত করা যাচ্ছে। গত ৭০ বছর দানবীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন বা আফস্পা চালু রেখেও যা করা যায়নি। মেইতেই, কুকি, নাগা সহ সমস্ত জনজাতি, সেনা শাসন আর আফস্পার বিরুদ্ধে দীর্ঘ্য সংগ্রাম চালিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান জাতিদাঙ্গার পর কুকি প্রজাতির মহিলারা সেই দানবীয় আইন আফস্পা বহাল রাখার এবং জাতি নিপীড়নকারী রাষ্ট্রীয় বাহিনী আসাম রাইফেলসকেই তাঁদের এলাকায় বলবৎ রাখার দাবি জানাচ্ছেন। অন্যদিকে, বিরোধিতা করছেন মেইতেই'রা। সেনাবাহিনীকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়ে আফস্পা চালু রাখার উগ্রজাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রীয় ধারণা এভাবেই জিতে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে স্বাধীনচেতা মণিপুরি জাতিসত্ত্বা, যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন প্রবাদ প্রতিম বিপ্লবী হিজাম ইরাবত সিংহ, যিনি মণিপুরের রাজা বোধচন্দ্র সিংহের আত্মীয় হয়েও রাজতন্ত্রের প্রজা শোষণের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন এবং সেই অপরাধে রাজা বোধচন্দ্র দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অন্তর্ধানে চলে গিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ক্ষমতার আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের পর ভারত ও পাকিস্তান দুটি ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান বা কমনওয়েলথ রাষ্ট্র গঠিত হলেও তখন মণিপুর কোনো অংশে যোগদান করেনি। এর বহু পরে ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই পটেলের নির্দেশে মণিপুরের স্বাধীন রাজা

বোধচন্দ্র সিংহকে গৃহবন্দী রেখে ভারতভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হল, সাধারণ মণিপুরবাসীর মতামত ছাড়াই। বিপ্লবী জননেতা ইরাবত সিংহ তখন ছিলেন অজ্ঞাতবাসে। এই হল স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য মণিপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সুতরাং, মণিপুরের সমস্ত জনজাতির ভারত রাষ্ট্রের ও সরকারের প্রতি ক্ষোভ থাকা ঐতিহাসিক ভাবে অস্বভাবিক নয়। কিন্তু বর্তমান ভারত শাসকেরা সুকৌশলে সেই ক্ষোভ আর স্বাধীনচিত্তকে নস্যাৎ করে দিতে এনেছে তভাগ করো, শাসন করো নীতিদ, যে নীতির প্রায়োগিক রূপ হল এই রাষ্ট্রীয় মদতে জাতিহিংসা। আর, এই জাতিদাঙ্গার ফলে রাষ্ট্রশক্তির অপর লাভটির কথা আগেই বলা হয়েছে, মণিপুরের প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদভাণ্ডারকে কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া।

কাজেই, লালকেল্লার ভাষণে যতই আশ্বাসবাণী থাকুক, মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে বহু দেরি আছে। রাষ্ট্র তার কার্যসিদ্ধি না হলে এই ঘৃণা আর সন্ত্রাসের পরিস্থিতিকে বদলাবে না। কাজেই সমাজকর্মী, মানবাধিকারকর্মী আর গণতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন সংগঠনগুলিকেই দায়িত্ব নিতে হবে মণিপুরকে বাঁচানোর। মানবতাকে বাঁচাতে আমদেরও কাঁধে নিতে হবে সেই গুরুভার।

স্কুল শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যত

শাহানারা খাতুন

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ৮২০৭ টি সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, এদের শিক্ষার্থী সংখ্যা তলানিতে। ত্রিশ জনেরও কম শিক্ষার্থী। স্কুল বন্ধের তালিকা তার পরের শিক্ষাবর্ষে আরও বাড়বে। কেননা সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা ক্রম হ্রাসমান। এর কারণ কী? পরিকাঠামোর অভাব? মোটেই না! গত পনেরো বছরে সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুলের ভোল অনেকটা বদলে গেছে। শ্রেণীকক্ষের অভাব নেই। শৌচালয় আছে। বিদ্যুৎ আছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। আছে, মডেল স্মার্ট ক্লাস রুম। সেখানে প্রজেক্টর দিয়ে আজকের চন্দ্রাভিযান থেকে অনেক কিছুই দেখানো যায়। লাইব্রেরি আছে। নানা রকম অনুদান আছে। গুণমান ভাল না-হলেও, মধ্যাহ্ন ভোজন আছে। তবুও শিক্ষার্থী সংখ্যা ক্রম হ্রাসমান। এর কারণ কী? এই যে, ৮২০৭ টি স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জনমানসে এর প্রতিক্রিয়া কী? কেন আমজনতা মুখ ফেরাচ্ছে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে? কারণ খুব অগভীর নয়। একটু তলিয়ে ভাবলেই উত্তর পাওয়া যাবে।

নব্বই দশকের নয়া উদার নীতি ও বিশ্বায়ন প্রথমেই গ্রাস করল তৃতীয় বিশ্বের বিশেষত ভারতবর্ষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে। এতে ইন্ধন জোগালো ১৯৮৬ এর জাতীয় শিক্ষানীতি। ১৯৯২ এর সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণে বিশ্ব ব্যাংক থেকে টাকা ধার নেওয়া হলো। ১৯৯৩ সালে, উন্নিকৃষ্ণন্ন ও অন্যান্যরা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার অধিকারকে 'একটি অধিকার' হিসেবে গণ্য করে বলেন, ''এদেশের নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। সংবিধানের ২১ ধারা থেকে এই অধিকার জন্মায়। কিন্তু এটি চরম অধিকার নয়। এর অন্তর্বস্তু ও প্রয়োগ ৪৫ এবং ৪১ ধারার দ্বারা নির্ধারিত। অন্য অর্থে এ দেশের প্রতিটি শিশু-নাগরিক ১৪ বছর বয়স অবধি বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী। তারপর তার শিক্ষার অধিকার রাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্গতির দ্বারা সীমাবদ্ধ।'' এই রায়ের পর দেশব্যাপী শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করার দাবি ওঠে।

২০০২ সালে সংবিধান সংশোধন করে ৮৬ তম সংশোধনীতে ২১ (ক) ধারা যুক্ত হয়। এই ধারায় বলা হয়, ''রাষ্ট্র ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সব শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে করবে, যা রাষ্ট্র আইনের দ্বারা স্থির করবে।'' (এই আইন হল, RTE Act. আর এই আইনের ফাঁক গলেই আজকের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি।)

রাষ্ট্র সব শিশুর বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করতে গিয়ে দেখল যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা' ভাঁড়ারে নেই। ভারতে বছরে প্রায় ২.৫ কোটি শিশু জন্মায়। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য ১৪ হাজার কোটি ব্যয় বরাদ্দ হলো। এই সামান্য টাকায় সব শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। তাই, বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হলো। টাকা ধার করা হলো (IDA, UDA, WORLD BANK থেকে। বেসরকারিকরণের দরজা খুলে দেওয়া হলো।

দেশের বিপুল সংখ্যক শিশু শিক্ষার্থীর শিক্ষার ভার তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হলো। ফলে অলিতে গলিতে নানা কিসিমের বেসরকারি স্কুল ও দিল্লি বোর্ডের স্কুল গজিয়ে উঠলো। এর সাথে যুক্ত হলো নব্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার গল্প। প্রাথমিক থেকে ঝট করে ইংরেজি তুলে দেওয়ায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাঁদে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষাকে যেন আরও তীব্রতর করলো। দেশের মানুষ মুখ

ফিরিয়ে নিল বাংলা মাধ্যম স্কুল থেকে। ব্যতিক্রম অবশ্যই রইলো। সেগুলি হল জেলার নামকরা স্কুল। এই ব্যতিক্রমের পিছনেও কারণ আছে। ২০১০ এর RTE ACT অনুযায়ী দশ শতাংশ সরকারি এবং সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলকে উন্নীত করার কথা ছিল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বা নবোদয় বিদ্যালয়ের মতো। সেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা অটুট রইলো। অবশ্য বর্তমানে সেখানেও আগের থেকে চাপ কম। আর ডাবল রিফাইন, ট্রিপিল রিফাইন করে ছাত্র ভর্তি করতে পারছে না।

বাংলা মাধ্যম সরকারি স্কুলের দৈন্যদশার আরও একটি কারণ ভ্রান্ত শিক্ষানীতি, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার গুণগত মানের অবনমন,ব্যবহারিক মূল্যায়নের অকার্যকারিতা। শিক্ষার সার্বিক বিস্তারে, সবার জন্য শিক্ষা এই নীতিকে সামনে রাখতে গিয়ে বাংলা মাধ্যম সরকারি স্কুলের সিলেবাস হল প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর কথা মাথায় রেখে। কোথাও অনাবশ্যক জটিল, কোথাও অনাবশ্যক সরল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের শিক্ষার্থী এই সিলেবাসে আস্থা হারালো। No Detention পদ্ধতিও শিক্ষার্থীকে অনেকাংশে অনাগ্রহী করলো। তারা ধরেই নিল না-শিখলেও পরের ক্লাসে ঠিক পৌঁছে যাবো। অপরিণামদর্শী লকডাউন একে আরও তীব্রতর করলো। আগে একধাপ পেরোতে। এবার, একেবারে দু'ধাপ। শিক্ষাদান পদ্ধতিও শিক্ষার্থী হীনতার একটা কারণ। এক) শিক্ষকদের শিক্ষাদান ছাড়াও একাধিক সরকারি দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষকদের। দুই) এক শ্রেণীর শিক্ষক গতানুগতিক পদ্ধতিতে পাঠদান পদ্ধতি বজায় রাখলেন। তিন) শুনতে খারাপ লাগলেও, আমি নিজেও শিক্ষক, এক শ্রেণির শিক্ষক আসি-যাই, মাইনে পাই,কাজ করলে উপরি চাই পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। শিক্ষকতাকে সমাজসেবা মূলক কর্ম না-ভেবে বাঁধা মাইনের নির্দিষ্ট duty hour এর চাকরি হিসেবে দেখলেন। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কিসস্যু হবে না ভেবে অবহেলা করলেন। স্কুলগুলোর মান দিন দিন কমতে লাগলো। আর তাই শিক্ষিত আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারের শিক্ষার্থী চলে গেল বেসরকারি স্কুলে।

এছাড়াও আর যে কারণটি রইলো, তা হল শিক্ষার ব্যবহারিক দিক। কী কাজে লাগবে শিক্ষা? শিক্ষান্তে শিক্ষার্থী কী কাজ পাবে? বড় প্রশ্ন। সরকারি নিয়োগ প্রায় নেই। কিছু করে কম্মে খেতে হবে। আর কিছু করতে হলে গ্যাট ম্যাট করে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইংরেজি বলতে হবে । বাংলা মাধ্যম সরকারি স্কুলে সে সম্ভাবনা কই? তাই ভরসা ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল।

জনমানস নির্বিকার! হাসপাতালে চিকিৎসা করতে যায় গরিব গুর্বোরা। সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুলেও পড়ে, পড়বে নেহাতই যাদের উপায় নেই, আর্থিক সঙ্গতি নেই, তারা! কিংবা এখনও কিছুজন, কিছুটা ভরসা রাখেন বলে। স্কুলগুলি উঠে গেলে কী হবে? সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া তাদের কথা শোনার লোক নেই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের ভাবনা সবার যা হবে তাদেরও তাই হবে! এ-নিয়ে রাজনীতি করার জন্য অন্য লোক আছে। তাদের কোনো দায় নেই। আর বাংলা মাধ্যম সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা তো আগেই আত্মসমর্পন করে বসে আছেন। তাঁদের প্রায় সকলের সন্তান বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে। সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার,ব্যারিস্টার হবে। পাতি বাংলা মাধ্যম স্কুলে মরতে তাঁদের ছেলেমেয়েরা কেন পড়াতে আসবে! অতএব বাংলা মাধ্যম সরকারি স্কুল থাক বা যাক, স্কুল খুলুক বা না খুলুক, মাস পয়লা বেতন ঢুকলেই হবে। তাঁদের দেখে কবি মোহিতলাল মজুমদার এর ঐ পংক্তিটি খুব মনে পড়ে, ''ফাঁসির কয়েদী ওজনে বাড়িছে ধন্য সে সুখচোর।''

তাই দু'বছর লকডাউনে তাঁরা সব গর্তে সেঁধিয়ে গিয়েছিলেন। রেল বেসরকারিকরণ হলে রেল কর্মচারী আন্দোলন করেন ব্যাংক বেসরকারিকরণ হলে ব্যাংক কর্মচারী, কৃষি বিল হটাতে কৃষকরা। শুধু শিক্ষা বেসরকারিকরণ হলে শিক্ষকরা নীরব। যাঁদের গর্জে ওঠা দায় ছিল তাঁরাই আশ্চর্যজনকভাবে নীরব রয়ে গেলেন। আর ভাতাজীবি, অনুদান জীবি জনসাধারণ আস্থা রাখছেন ফোকটে কিছু পাওয়ার আশায়। তাই সন্তানের শিক্ষা নিয়ে তাঁদের কোনো ভাবনা নেই। শিক্ষক-অভিভাবক মিটিং এ তাঁদের হাজিরা নেই। আগ্রহ নেই। কিন্তু সন্তানের 'শ্রী' যুক্ত অনুদানের ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার। লকডাউনের সময় স্কুল খুলুক-না-খুলুক কোনও হেলদোল নেই । মাসে মাসে চাল-আলু পেলেই হবে। কোথায় স্কুল বন্ধ হল, তাতে কার ক্ষতি হলো, তাঁদের নিজের সন্তান সন্ততিদেরই বা কী হবে; এসব ভাবনা তাঁদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। এঁরা চোখে দেখেও, দেখেন না। কানে শুনেও শোনেন না! শুধু বিশ্বাস করেন নেতার মোহিনী ভাষণ।

এপিডিআর-এর মুখপত্র
'অধিকার' পড়ুন ও পড়ান

আমার ভারত ওদের ভাষ্য

সোমনাথ বসু

যোজনা কমিশনের উদ্যোগে ২০০৬ সালে, উন্নয়নের পথে (মাথা চড়া দেওয়া) অসন্তোষ, অশান্তি এবং চরমপন্থার কারণ অনুসন্ধানে ১৬ জন বিষিষ্ট সদস্য নিয়ে একতি বিশেষজ্ঞমন্ডলী তৈরী হয়। ২০০৮ শালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। যদিও এই রিপোর্ট জন-সমক্ষে আসেনি।

(তৃতীয় কিস্তি)

সামাজিক বৈষম্য

আমাদের সমাজে দলিত সম্প্রদায়কে আলাদা চোখে দেখা হয়। এটা চিরকাল সহ্য করতে হয়েছে! আজও সইতে হচ্ছে। তাদের থাকা,তাদের খাওয়া,তাদের পোশাক, তাদের চাকরি, তাদের বিয়ে...সবকিছুতেই এই অন্য চোখে দেখা চলছেই।

এমন-কী অস্পৃশ্যতা পর্যন্ত নানান মাত্রায়, নানান রূপে এখনও পর্যন্ত জলজ্যান্ত বর্তমান। সম্প্রতি দেশের এগারোটি রাজ্যের ৫৬৫টি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে এখনও এদেশের গ্রামীণ এলাকায় টিকে থাকা অন্তত তেষট্টি (৬৩) রূপে অস্পৃশ্যতার অস্তিত্বের খবর পাওয়া গেছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে আজও বহু গ্রামে নিম্নবর্ণের মানুষ হওয়ার অপরাধে তারা গ্রামের শ্মশান ব্যবহার করতে পারে না। ঘরের ছেলেমেয়েরা সরকারী স্কুলেও অন্যদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে পর্যন্ত পারে না। আরও কত-রকম ভাবে এই ছোঁওয়া-ছুঁই'র নামে নির্মম বঞ্চনা চলে তা নীচের সারণী থেকে কিছুটা বোঝা যাবে।

সমীক্ষাভুক্ত ৫৬৫টি গ্রামের মধ্যে শতকরা হার (শতাংশ) যেখানে অস্পৃশ্যতা : আছে / নেই / অনিশ্চিত

১. উঁচুবর্ণের লোকেদের বাড়িতে প্রবেশধিকার- ৭৩ /১৭ /১০

২. উঁচুবর্ণে সঙ্গে, একসঙ্গে খাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা- ৭০/২২ /৪

৩. উঁচুবর্ণের উপাসনার জায়গায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা- ৬৪/২৯/৭

৪. গ্রামের শ্মশানে শবদাহ করতে না-দেওয়া- ৪৯/৪৬/৫

৫. গ্রামের জল নেওয়ার জায়গায় যেতে না-দেওয়া- ৪৮/৪৪/৮

৬. প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে বিয়ের শোভাযাত্রা না-যেতে দেওয়া- ৪৭/৫০/৩

৭. নাপিত বয়কট- ৪৭ /৪১/১২

৮. গ্রামের দোকান থেকে কেনাকাটা করতে না-দেওয়া- ৩৬/৫৭/৭

৯. সরকারী স্বাস্থ্য কর্মীরা দলিতদের বাড়ি যায় না- ৩৩/৫৬/১১

১০.হোটেল/ রেস্টুরেন্টে আলাদাবসতে হয়- ৩৩/৫৮/৯

১১.থানায় গেলে দলিত দের প্রতি ব্যবহারে বৈষম্য- ৩২/৪৯/১৯

১২.পঞ্চায়েত অফিসে পর্যন্ত তাদের আলাদা বসতে হয়- ৩০/৬৬/৪

১৩. উঁচু বর্ণের মানুষের সামনে বসা যায় না, দাঁড়িয়ে থাকতে হয়- ২৬/৬৮ /৬

১৪. বাড়িতে চিঠি পৌঁছানো হয় না- ২৪/৭১/৫

১৫. সরকারী বিদ্যালয়ে পর্যন্ত দলিত ছাত্ররা উচ্চবর্ণের সঙ্গে বসতে পারে না। আলাদা বসার ব্যবস্থা থাকে- ২২/৭৫/৩

১৬. পশু চরাতে গেলে বা মাছ ধরতে গেলেও বাধা পেতে হয়- ২১/৭২/৭

১৭. এমনকি ডাকঘরের ভিতরেও অস্পৃশ্যতার ঘটনা ঘটে- ১৯/৭৬/৫

১৮.দলিতদের রাস্তায় ছাতা খোলার ও অধিকার নেই-১৭/৮০/৩

১৯. ভোটকেন্দ্রেও জাতভিত্তিক পৃথক লাইন দেখা যায়- ১২/৮৩/৫

২০ অনেকক্ষেত্রে দলিতরা রাস্তায় সাইকেল পর্যন্ত চালাতে পারে না- ৭/ ৯১/২

Source: Shah, G. Mander, H.,Thorat, S., Deshpande, S., and Baviskar, S[3]. (2006), Untouchality in Rural India (New Delhisage), pp 103-5

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা

গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকহারে SC সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন, অপরাধ ও অত্যাচার চিরকাল ধরেই চলে আসছে।

নাগরিক অধিকার (যেমন ভোট দিতে পারা, সর্ব-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে প্রবেশাধিকার... ইত্যাদি)

সামাজিক অধিকার (যেমন ইচ্ছামত যে কোন স্থানে যাতায়াতের অধিকার, শিক্ষা পাওয়ার অধিকার...ইত্যাদি)

অর্থনৈতিক অধিকার (সম্পত্তির মালিকানার অধিকার, পেশা বদলানোর অধিকার, ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকার, কর্মস্থলে ইউনিয়ন করার অধিকার)

রাজনৈতিক অধিকার (গণতান্ত্রিক শাসনপ্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ও অংশীদারিত্বের অধিকার...)

এসবই মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে আর বাস্তব হলো সেসবের স্থায়ী লঙ্ঘনই এক চিরকালীন পরম্পরা।

SC সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়ন, নির্যাতন ও অধিকার লঙ্ঘনের নথিভুক্ত তালিকা—

2003-এ ছিল— 26,252

2004-এ ছিল— 26,887

2005-এ ছিল— 26,127

আদিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় একটি পরিসংখ্যান

	1991	1999	2000
Total Cases	8,029	115,878	116,131
Cases disposed off	---	8673 (7.5%)	12956 (11.2%)
Conviction Cases	125 (1.6%)	700 (0.6%)	982 (0.9%)
Aquital Cases	1367 (17%)	7420 (6.4%)	11605 (10%)
Cases Pending	6537 (81.4%)	107204 (92.5%)	100891 (86.9%)

Source: National Commission For Sheduled Castes and Sheduled Tribes, 1991,1999-2000 and 2000-2001.

(ক্রমশ)

বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় সংস্থা, বি এস এন এল ধ্বংসের পথে

সন্দীপ সিংহ রায়

ঝোলা থেকে বেড়ালটা বেড়িয়েই পড়েছিল। ২০০০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা ভারতীয় টেলিফোন দপ্তরকে সুনির্দিষ্টভাবে বললে, ডিপার্মেন্ট অফ টেলিকমিনিউকেশন সারা দেশব্যাপী টেলিকম পরিষেবাকে কেবলমাত্র রাজধানী দিল্লী ও অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বাইকে বাদ রেখে বি এস এন এল তথা 'ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড'-এ পরিণত করেছিলেন।

এর একদশক আগে ১৯৯১ সালে, কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও ও তাঁর সরকারের অর্থমন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের পেনশনভোগী, লাইসেন্সরাজ খতম করার নাম করে নয়া অর্থনীতি ও নয়া শিল্পনীতি প্রণয়ন করেন। ভারতের বিশাল বাজারের দরজা, ভারতীয় মুৎসুদ্দি পুঁজি ও বিদেশী কর্পোরেট পুঁজির কাছে উন্মুক্ত করে দেন। মর্মবস্তুতে এই সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল্ দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব কলকারখান বিক্রি, মাটির তলার বিপুল খনিজ সম্পদ বাধ লুণ্ঠনের প্রক্রিয়া। এরই ধারাবাহিকাতায় ভারতীয় টেলিকম দপ্তরের বি এস এন এল-এর রূপান্তরকরণ।

প্রাইভেট অপরেটারদের তুলনায় ভারতীয় আকাশপথ তথা স্পেকট্রাম ব্যবহারে সোজা কথায় মোবাইল পরিষেবা প্রদানে বি এস এন এল-কে সাত বছর বঞ্চিত রাখা সত্বেও ২০০৬ সালে ১০ হাজার ৬০০ কোটি টাকা লাভের মুখ দেখা বি এস এন এল-কে তিলে তিলে হত্যা করা হয়েছে। মোদী সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে তা' একই সংগে গভীর শোক ও ক্রোধের জন্ম দেয়।

দেশের আম জনতার কাছে যখন ৫জি পরিষেবা কড়া নাড়ছে তখন এই ২০২৩-ও বি এস এন এল ৩জি পরিষেবা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

দেখা যাক বি এস এন এল-কে, কী-ভাবে টুঁটি টিপে হত্যা করা হচ্ছে—

১) টেলিকম শিল্পে সর্বাধিক ঋণগ্রস্ত জিও'র ঋণের পরিমান দুই লক্ষ সাতাশি হাজার কোটি টাকা। ভোডাফোন আইডিয়া'র ঋণ এক লক্ষ আঠারো হাজার কোটি টাকা। বি এস এন এল-এর সবচেয়ে কম, চোদ্দ হাজার কোটি টাকা। সফট লোন ও ৪জি'র লাইসেন্স পেলে এই রাষ্ট্রয়াত্ব সংস্থাটি বেঁচে যায়। অথচ, মোদী সরকার রাশিয়ার বৈকাল হ্রদ এলাকায় তেল খনন ও উত্তোলনের দরুণ ওই দেশকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে সারা বিশ্বের ৬৩টি দেশকে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা সফট লোন দিয়েছিল। আর কর্পোরেট লোনগুলির একটি গাল্‌ভরা নাম আছে, অনাদায়ী ঋণ (এন পি এ), আসল-তো দূরের কথা, সুদটুকুও এরা দেবে না।

২) ২০১৯-এর জানুয়ারী থেকে অস্থায়ী ঠিকা কর্মীদের বেতন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল, যেটি বেতন বন্ধেরই সামিল। আর স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন হচ্ছিল মাসের শেষ তারিখের অনেক পরে। পিছিয়ে-পিছিয়ে আর্থিক ফান্ড এলে তবেই। ফলে, 'ভি আর এস'-এর গাজর চোখের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া মাত্র ৭৮৫৬৯ জন গ্রুপ এ বি সি ডি কর্মচারী স্বেচ্ছাবসার নিতে বাধ্য হয়েছেন কার্যত।

৩) স্পেকট্রাম নিলামের মুল্য বাবদ মোদী সরকার বি এস এন এল-এর ৪০ হাজার কোটি টাকা দিতে বাধ্য করেছিল, যেখানে এই সংস্থাটি সম্পূর্ণভাবে সরকারি। একদা চা বিক্রেতা বলে গর্ববোধকারী নরেন্দ্র মোদী-যে দেশ বেচা কর্মসূচীতে হাত

দিয়েছেন, সেখানে বি এস এন এল-এর উপর খড়্গহস্ত, বিমাতৃসুলভ আচরণের কিছু কাহিনী তুলে ধরছি।

৪) ২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারীর কথা আপনারা জানেন। ২জি স্পেকট্রাম এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা আম্বানী ভাইদের ছাড় দেওয়া হয়েছিল। না-হলে ওই পরিমাণ টাকা সরকারের কোষাগারে ঢুকতে পারতো।

৫) ট্রাই মাশুল যুদ্ধে উর্দ্ধসীমা বেঁধে দিয়েছিল কিন্তু নিম্নসীমা নয়। কিন্তু এই হিসেবে একটু ফাঁক আছে, যাকে বলে প্রিডেটরি প্রাইসিং। জিও রাষ্ট্রয়াত্ব ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করে মাছের তেলে মাছ ভাজার মত ট্রাই নির্ধারিত মাত্র সত্তর দিনের সময় পরেও পার্সোনাল অফার নামে প্রি-অফার চালু রেখেছিল। আর প্রিডেটরি প্রাইসিং মানে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিদের বাজার থেকে হটাতে কু-মতলবে কোন সংস্থা যদি ক্রয়মূল্যের নীচে পরিষেবা বা পণ্য বিক্রি করে তাকে বলে প্রিডেটরি প্রাইসিং। এর ফলে, বি এস এন এল-তো বটেই অন্যান্য প্রাইভেট অপারেটর সহ এমন-কী অনিল আম্বানীর রিলায়েন্স ইনফোকমও বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

৬) প্রাইভেট অপারেটর গ্রামীণ পরিষেবা না-দেওয়ার দরুণ বি এস এন এল বছরে ১২৫০ কোটি টাকা দিতে বাধ্য থাকত। মনমোহন সিং এটি তুলে দেন ও সেই আমলেই বি এস এন এল-এর এস টি ডি ও পি সিও বুথের সারা ভারতব্যপী লাভজনক ব্যবসাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

৭) যখন একটি কল প্রথম কোম্পানী থেকে দ্বিতীয় কোম্পানীতে যায়, তখন প্রতি মিনিটে ইন্টারকানেক্ট ইউজেস চার্জ (আই ইউ সি) দ্বিতীয় কোম্পানী পেয়ে থাকে প্রথম কোম্পানী থেকে। যেহেতু জিও'র গ্রাহক সংখ্যা বেশী ফলে তাকে আই ইউ সি দিতে হত বেশী। ট্রাই আই ইউ সি কমিয়ে জিও'র বিপুল মুনাফা ও বি এস এন এল সহ প্রত্যকের রাজস্ব আদায় ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

৮) জাতীয় প্রতিরক্ষা বা বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষত্রে বি এস এন এল-এর অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক ৭.৫ লক্ষ রুট কিলোমিটার, যেখানে জিও'রও ও এফ সি ৩.৫ লক্ষ রুট কিলোমিটার। এয়ারটেল ও ভোডাফোনের ও এফ সি যথাক্রমে ২.৫ লক্ষ কিলোমিটার এবং ১.৬০ লক্ষ কিলোমিটার। বি এস এন এল-এর অব্যবহৃত জমির দর এক লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু এই বিপুল সম্পদ যা বি এস এন এল-এর একান্ত নিজস্ব-তার হাতে তুলে না-দিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার 'স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যাল' বা এস পি ভি নামে একটি ভুঁইফোর সংস্থার হাতে জলের দরে তুলে দিতে চাইছে, অর্থাৎ বি এস এন এল-এর ক্ষত্রে কেবল 'না'।

৪জি-না, ব্যঙ্ক ঋণ-না, নিজস্ব বিপুল সম্পদ ব্যবহারে ন্যায্য দাবি-না।

৯) তবুও অবশিষ্ট কিছু সর্বভারতীয় সুদক্ষ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী ও আধকারীকদের একটি 'ক্ষুদ্র গোষ্ঠি' বি এস এন এল-কে রক্ষা করার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ৩জি-কে প্রযুক্তিগতভাবে তারাও সাড়ে-৩জি-তে উন্নিত করে যঠেষ্ট ভাল পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

বঞ্চনার বহু কাহিনী ঘটনাক্রম বাকী রয়ে গেল স্থানাভাবে। শুধু ঠিকা কর্মীদের দিয়েই শেষ করি; নিজ সংস্থার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কর্পোরেটদের পদলেহী এই সরকার আর্থিক অবরোধ ঘোষণায় ভীত, সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত কর্মচারীরা বিপুল সংখ্যায় ভি আর এস নিয়েছেন। মন্ত্রী মহোদয় কথিত বিপুল অঙ্কের টাকা নয় মোটেই কিন্তু পি এফ সহ কিছু অতিরিক্ত এক্সগ্রাসিয়া পেয়েছেন, পাচ্ছেন পেনশনও। কিন্তু ভারতের বিপুল জনারণ্যে হারিয়ে গেছেন ঠিকা কর্মীরা। এই প্রতিবেদক অন্ততঃ চোদ্দজন ঠিকা কর্মীর আত্মহননের কথা জানেন।

কেরলের মল্লিপুরমে বি এস এন এল অফিসের ভিতরেই একজন ঠিকা শ্রমিক আত্মহনন করেছিলেন।

'মেরা ভারত মহান' আরও ২৬২৮ রাফায়েল যুদ্ধবিমান আসছে ফ্রান্স থেকে। কিন্তু শত্রু কে? স্বদেশবাসী নয়-তো?

সনৎ রায়চৌধুরীর জীবনাবসান

দেবাশীষ গুপ্ত

সনৎ রায় চৌধুরীর জীবন কথা
জন্ম— ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯
মৃত্যু— ১লা জুলাই ২০২৩

সনৎ রায় চৌধুরী। সনৎ-দা, নামটা কেউ উচ্চারণ করলে আর দ্বিতীয় পরিচয় প্রয়োজন হ'ত-না। সনৎ'দার সুদীর্ঘ্য রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বটি কেটেছিল মৌলানা ভাসানীর সাহচর্য্যে। ১৪ বছর বয়সেই সনৎদা ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং সেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু, যা শেষ দিন অবধি নিরবচ্ছিন্ন ছিলো।

শান্তিলতা এবং গৌরী শংকরের চতুর্থ পুত্র সনৎ'দার জন্ম

হয়েছিল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে অখন্ড বাংলার রঙপুর শহরে। খুব কম বয়স থেকেই তিনি পূর্ববঙ্গের বামপন্থী রাজনীতি বিশেষ করে সমসাময়িক কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রসঙ্গত ১৯৫৪ সালে কমিউনিষ্ঠ পার্টি নিষিদ্ধ হলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টী (ন্যাপ)-এর মধ্যে কমিউনিষ্ট কর্মীরা কাজ করত। সনৎদার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মৌলানা ভাসানীর প্রভাবের কথা সনৎদা নিজে বহুবার ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছেন। একবার,কিছু বিশেষ দরকারে সনৎ'দা ভাসানিকে কাগমারিতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন রংপুরে, ততদিনে কলেজে ভর্তি হওয়ার শেষদিন পার হয়ে গেছে। পরিবার, তাঁর এবং বন্ধুদের দুশ্চিন্তা দূর করেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু কমরেড আফজল হোসেন। তাঁর হাত ধরেই সনৎ রায় চৌধুরী কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই সনৎ-দার অনুপস্থিতেই তাঁকে কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে এডমিশন করিয়ে দিয়েছিলেন ন্যাপের একজন শীর্ষনেতা মশিউর রহমান যদু মিঞা। পরে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ওই একটা ঘটনা থেকেই বোঝা যায় ১৯৫০ দশকেই সনৎ রায় চৌধুরী ছাত্র রাজনীতিতে কতটা জনপ্রিয় ছিলেন।

১৯৫৯-এর শেষের দিকে সনৎদাকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হয়। শিলিগুড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে ওঠেন। সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। ফাঁসিদেওয়া হাই স্কুলে চাকরী পেয়েছেন। রায় চৌধুরী পরিবারের আত্মীয় তথা রংপুরের প্রতিবেশী প্রবীর সেনগুপ্ত প্রমুখদের অনুরোধে এবং বড়'দা যিনি অনেক আগেই মানে '৪৭ -এর আগে থেকেই বৃটিশ আমলের সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং option দিয়ে এদেশে চলে আসেন তাঁর কাছেই থাকার উদ্দেশ্যে সনৎদা চুঁচুড়ায় চলে আসেন। ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সনৎ'দার যোগাযোগ কিন্তু একদিনের জন্যও ছিন্ন হয়নি। এরই মধ্যে দেশবন্ধু হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তী কালে CPI -তে রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে ১৯৬৪ সালে ভাঙন হলে যে বৃহদংশ সংগঠন থেকে বেড়িয়ে আসে; তাদের সঙ্গেই সনৎদা বেড়িয়ে আসেন। দেশবন্ধু স্কুলের চাকরী চলে যায়। কিন্তু ছাত্ররা সনৎদাকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। সনৎ'দা ইতিমধ্যে প্রবীর সেনগুপ্ত প্রমুখদের অনুরোধে সুগন্ধা হাই স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দিয়ে দিয়েছেন। সুগন্ধা স্কুলে যোগ দেওয়ার কথা শোনার পরেও ছাত্ররা আন্দোলন চালিয়ে যায়। সনৎদা এসে ছাত্রদের পড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলে তারা শান্ত হয়। কার্যত তখন থেকেই সনৎদার টিউশানি করা শুরু হয়। যা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চলে। ছাত্ররা ছিলো তাঁর প্রাণ। সনৎ রায় চৌধুরী শুধু শিক্ষক ছিলেন না, ছিলেন মানুষ গড়ার নিবেদিত এক প্রাণ। সেই ছাত্রদের অনেকের সাথেই সনৎ'দার যোগাযোগ ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

CPI-তে রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে ১৯৬৪ সালে ভাঙন হলে যে বৃহদংশ সংগঠন থেকে বেড়িয়ে আসে তাদের সঙ্গেই সনৎ'দা বেড়িয়ে আসেন। ইতিমধ্যে ভারত চীন যুদ্ধের সময় সনৎদাকে বেশ কিছুদিন জেলে কাটাতে হয়। CPI(M) গঠিত হলে সনৎ'দা তা'তে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ণদ্যোমে কাজ শুরু করেন । চন্দননগর থেকে ত্রিবেণী, এই বিস্তৃণ অঞ্চলে যাদের নেতৃত্বে পার্টি সংগঠন হৈ হৈ করে বাড়তে থাকে সনৎদা ছিলেন তাদের অন্যতম। সে সময় সনৎদার পরিশ্রমী ও নেতৃত্বদায়ী গুনাবলী পার্টিকে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।

বাম ফ্রন্ট সরকার গঠনের সময় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ হবে না'-এই ঘোষণাকে নস্যাৎ করে সরকার গঠনের মাত্র চার মাসের মধ্যে উত্তরবঙ্গে সেই সরকারেরই মূখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ; শিশু মহিলা সহ এগারোজন কৃষককে হত্যা ক'রে। এ ঘটনা CPI(M) কর্মী সহ পশ্চিমবঙ্গবাসীকে হতচকিত ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। পার্টির মধ্যে তুমুল তিরস্কার, বিতর্ক চলতে থাকে। সংগঠনে নিজের পদের তোয়াক্কা না করে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের স্বার্থে যারা প্রকৃত লড়াই করতে প্রস্তুত সেই বিপ্লবকামী মানুষদের সঙ্গে সনৎ'দা থেকে যান। অনেক আলাপ আলোচনার পর CPI(ML) গঠিত হলে সনৎ'দার নেতৃত্বে চুঁচুড়ায় নতুন পার্টি সংগঠনের কাজ শুরু হয়। কিছুদিন চলার পরই ২০শে অক্টোবর ১৯৭০-এ রেবন্ত ঘোষ, মুনিকেশ শীলের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। ছাড়া পান ১৯৭২-এ চারু মজুমদারের মৃত্যুর কিছুদিন পর, ১৯৭২-এর আগষ্টে।

সত্তরের দশকের জল্লাদের বধ্যভূমি হয়ে ওঠা পশ্চিমবাংলায়, প্রমোদ সেনগুপ্ত, কপিল ভট্টাচার্য প্রমুখেরা প্রবল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরূদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ.পি.ডি.আর) গঠন করেন। জেলে বসেই এই খবর পেয়ে ছিলেন সনৎদা। জেল থেকে বেড়িয়ে সনৎদা এপিডিআর-এ যোগ দেন। ইতিমধ্যে নকশালবাড়ি আন্দোলন ক্ষীয়মাণ এবং হাজার-হাজার যুবক-যুবতি পশ্চিমবঙ্গ ও বিভিন্ন রাজ্যের জেলে বন্দি। অধিকার কর্মী ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক মানুষের উদ্যোগে বন্দিমুক্তি আন্দোলন দানা বাধতে শুরু করল রাজ্যে। সনৎ'দার ডাকে সাড়া দিয়ে যে-সব

ছেলে মেয়েরা আন্দোলনে নেমেছিল তাদের পরিবার-পরিজনের অনুরোধে সনৎ'দা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বন্দিমুক্তি আন্দোলনে।

১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করলেন। তার আগেই কয়েক বছর যাবৎ সব ধরণের মানবিক ও মৌলিক অধিকারকে দু'পায়ে মাড়িয়ে সরকারি সশস্ত্র বাহিনী ও শাসক দলের পেটোয়া গুন্ডারা মিলিতভাবে জেলখানার ভিতরে এবং বাইরে বেপরোয়া হত্যা, গ্রেপ্তার, নৃশংস অত্যাচার ও দমন-পীড়ন চালিয়েছিলো। সেই

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চেহারা দেখিয়ে 'গণতন্ত্রের স্বরূপ' বলে তথ্য বহুল বইটি প্রকাশ করার চেষ্টা চলছিল। ছাপাও হয়ে গেছিলো। এপিডিআর এবং বইটিকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় প্রেসে পুলিশ হানা দেবার আগেই প্রেসে থাকা বইটির কপিগুলো বাঁচানোর জন্য উত্তরপাড়ার অশোক কান্তিদের সহযোগিতায় সনৎ'দা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন এবং সেগুলিকে রক্ষা করেছিলেন। ফলে এমার্জেন্সী উঠে যাওয়ার পর সে মূল্যবান বইটি ১৯৭৭ সালে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। সেটি আজ গল্প কথায় পরিণত।

১৯৭৭ সালে জরুরী অবস্থার অবসানের পর বামফ্রন্ট সরকার গঠন হয়। বামফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিলো 'সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি' দেওয়া হবে। সেই মতো বন্দিমুক্তি আন্দোলনের যে কর্মীরা জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন, সনৎদা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'মাত্র কয়েক'শ বন্দি আছে জেলে', জ্যোতিবাবুর এই কথার প্রত্যুত্তরে সনৎ'দা সহ অন্যরা অত্যন্ত জোর দিয়ে দাবি করেন, 'না ,কয়েক হাজার শুধু নকশাল বন্দি আছে জেলে'। জেলে তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পেলে সেই সব বন্দীদের তালিকা বানানো সম্ভব, বলেছিলেন সনৎ'দা। সনৎ'দারা ভাগ ভাগ করে সব জেলে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে ছিলেন। সনৎদা নিজে হুগলী জেল এবং উত্তর বঙ্গের জেলগুলি ঘুরে-ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের নির্ভুল প্রমাণ করেন।১৯৭৭-৭৮ সালে রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে সরকারকে বাধ্য করতে পারাটা অধিকার আন্দোলনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করতেন সনৎ'দা ।

সত্তরের শেষার্ধে ও আশির দশকের শুরুতে হুগলী জেলায় সনৎ'দার ডাকে বেশ কিছু মানুষ অধিকার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। এপিডিআর তাঁর খুব প্রিয় সংগঠন ছিল। এপিডিআর-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শ্রীরামপুরের সভায় পুরোনো দিনের সহকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যেকার আনন্দ উত্তেজনা দেখে আমরাও খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। APDR-এর ছোট, বড় সমস্ত কর্মসূচী ও বিতর্কে তিনি অংশগ্রহন করতেন। সনৎদা চুঁচুড়ায় আছেন এবং সুস্থ আছেন অথচ চুঁচুড়া শাখা অথবা চুঁচুড়ায় হুগলী জেলা কমীটির প্রোগ্রামে উপস্থিত নেই এমনটা প্রায় ঘটেইনি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কোনও কর্মসূচীতে তিনি অনুপস্থিত থাকলে কর্মসূচীটি আমাদের কাছে অসম্পূর্ণ মনে হোত। কোনও ভাবনা বা কাজ সংগঠনের গঠনতন্ত্র বিরোধী মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করে দিতেন। তিনি রাজনৈতিক মঞ্চ এবং অধিকার মঞ্চকে পৃথক রাখতে বলতেন। সংগঠনের সংকটের সময় অভিভাবকের মত বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, সাহস দিয়ে সাহায্য করেছেন।

এরপর সনৎ রায় চৌধুরী বিনোদ মিশ্রদের সংগঠনে যোগ দেন পরে যার নাম হয় CPIML Liberation। ১৯৮১ -তে IPF গঠিত হলে রাজ্য সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বিগুণ উদ্যোমে সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন। জ্জঞ্চ ছিলো সনৎদার প্রিয় সংগঠন। পরবর্তীকালে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যপদে না থাকলেও বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোনও দিন ছিন্ন হয়নি।

একই রকম ভাবে শ্রমজীবি স্বাস্থ্য উদ্যোগ ছিল তাঁর বড় প্রিয় সংগঠন। প্রথম থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত। চুঁচুড়া শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প-তো নিজের হাতেই গড়ে তুলেছেন। কী-ভাবে সংগঠনটিকে বড় করা যায় এ-ছিল তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা। কত যে আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। যে দু'টি সংগঠনের সাথে জীবনের শেষদিন অবধি কাটিয়ে শান্তি পেয়েছেন সে-দু'টি হোল APDR এবং শ্রমজীবি স্বাস্থ্য উদ্যোগ।

চিরকুমার সনৎদার সংসারের সদস্য সংখ্যা ছিলো অগণিত। যে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় এমন স্বাচ্ছন্দ, মনের বিরাট উদারতা থাকলেই সম্ভব এবং তাঁর এই অভ্যাস আশেপাশের মানুষ জনকে প্রভাবিত করত। সারা জীবন ধরে রাজনৈতিক ও বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে মানুষের পৃথিবীকে বাস যোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। তিনি সনৎ রায় চৌধুরী।

এমন একজন মানুষের চলে যাওয়া মহীরুহ পতনের সমান। ১লা জুলাই ২০২৩-এর সন্ধ্যা আটটা কুড়িতে তার জীবনাবসান হলেও পরের দিন ভোর সাড়ে ছ'টায় বহু মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর দেহ কল্যাণীতে জে.এন.এম হাসপাতালে

জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। মৃত্যুর দিগন্ত জোড়া কালো মেঘের মধ্যে যেন বিলীন হয়ে গেল সনৎ রায় চৌধুরী, আমাদের প্রিয় সনৎ'দা।

তাঁর মত মানুষের মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পুরণ হবার নয়। কিন্তু আমরা যদি মানবাধিকার সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্রের কাছে প্রাপ্য সাধারণ মানুষের অধিকারগুলিকে আদায় ও রক্ষা করতেই আর একটু মনস্ক,আর একটু সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারি, সেটাই হবে অধিকার রক্ষা সংগঠনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সনৎ রায় চৌধুরীর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

তথ্যানুসন্ধান

বেহালা শাখার তথ্যানুসন্ধান— পথ দুর্ঘটনায় বড়িষা স্কুলের ছাত্রের মৃত্যুর তথ্যানুসন্ধান

গত ৪/৮/২০২৩, সকাল ৭টা নাগাদ বেহালা চৌরাস্তায় বড়িষা হাইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সৌরনীল সরকারকে (৭) স্কুল যাওয়ার পথে তার বাবার সাথে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটা ট্রাক চাপা দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছোট্ট সৌরনীলের, তার বাবা গুরুতর আহত হন।

খবর পেয়ে আমাদের শাখার তিন সদস্য ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি বিশাল পুলিশবাহিনী ও উচ্চএলাকায় মোতায়েন। স্কুলের গেট বন্ধ। এরপর আমরা স্থানীয় দোকানদার ও মানুষের সাথে কথা বলে জানতে পারি, এলাকার মানুষ ঐ ঘাতক ট্রাকটিকে ধরে ফেলেন, কিন্তু পুলিশ গিয়ে জনতার হাত থেকে ছাড়িয়ে ঐ ট্রাকটিকে নিরাপদে পালাতে সাহায্য করে। ফলে জনতা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের কাছে ক্ষোভ জানাতে থাকে এবং অবিলম্বে ঐ ট্রাকটিকে আটক করে ট্রাক চালকের শাস্তির দাবি করতে থাকে। এতে পুলিশ তাদের স্বভাব মতোই ক্ষিপ্ত হয়ে জনতার উপর যথেচ্ছ লাঠিচার্জ ও কাঁদনে গ্যাসের শেল ফাটানো শুরু করে। শুধু তাই নয়, হিংস্র পুলিশবাহিনী বড়িষা স্কুলের গেটের সামনে ও ভিতরে কাঁদনে গ্যাসের শেল ফাটায়, ফলে বেশ কিছু মানুষ এবং স্কুলের ভিতরে থাকা ছাত্রসহ শিক্ষক অভিবাবক আহত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারও কারও চোখ মুখ ঝলসে যায়। বাইরে পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জে আহত মানুষদের সাহায্য করতে স্থানীয় দোকানদার ও লোকজন জল নিয়ে এসে কোনওভাবে আহত ও অসুস্থ মানুষদের সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

এরমধ্যেই পুলিশের একটা অংশ আমাদের ও শুশ্রূষাকারী মানুষদের ছবি তুলতে থাকে এবং একপ্রকার জোর করে ঐ স্থান থেকে চলে যেতে বাধ্য করে। প্রায় ঘন্টা দু'য়েক ঘটনাস্থলে থেকে মানুষ ও দোকানদারদের সাথে কথা বলে আমরা জানতে পারি, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য পুরোপুরি দায়ী পুলিশের তোলাবাজি। তাঁরা জানান, বিভিন্ন পণ্যবাহী ট্রাক, ম্যাটাডর প্রভৃতি যানবাহন থেকে কর্তব্যরত পুলিশ দিনরাত তোলা তুলতে তৎপর থাকে। ফলে ট্রাফিক ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার মধ্য দিয়েই মানুষকে চলতে হয়।

জানা যায়, ঐ দিনই বিকেলে স্থানীয়দোকানদারদের বেহালা থানার বড়বাবু দেখা করতে বলেছে। এই বিষয়ে আর কিছু দোকানদাররা বলতে চাইছেন না।

বেহালা শাখার কর্মসূচী

গত ১৫ই জুলাই ২০২৩, মনিপুরে রাষ্ট্রের পরিকল্পিত জাতিদাঙ্গা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে, সমস্ত রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তি ও অবিলম্বে ইউ এ পি এ, আফস্পা, বৃটিশ আমলের কুখ্যাত দেশদ্রোহ আইন সহ সব-রকমের দমনমূলক আইন বাতিল এবং হেফাজতে বন্দি হত্যা বন্ধ ও ঐ কাণ্ডে যুক্ত পুলিশদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বেহালা ট্রামডিপোতে বিকেল ৪টেয় এক পথসভা ও মিছিল সংঘটিত হয়।

বেহালা চৌরাস্তায় পথ দুর্ঘটনায় শিশু ছাত্র মৃত্যুর পরের দিন ৫ আগষ্ট, ২০২৩, বড়িষা স্কুলের গেটের সামনে ও আশেপাশে পোস্টারিং করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ শাখার তথ্যানুসন্ধান— মুর্শিদাবাদের উমরপুর থেকে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবসায়ী বলে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ দ্বারা মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার

খবরের কাগজ ও নিউজ পোর্টালে প্রকাশ, গত ২৪ শে আগস্ট ২০২৩ রঘুনাথগঞ্জের কাঁটাখালি বিনপাড়া গ্রামের বেলু সেখ-কে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ উমরপুর তালাই মোড় থেকে আগ্নেয়অস্ত্র ব্যবসায়ী বলে গ্রেফতার করে ও জঙ্গিপুর কোর্ট ১৪ দিনের পুলিশ রিমান্ড দেয়।

রঘুনাথগঞ্জ ২ শাখার সদস্যরা ২৫ শে আগস্ট ২০২৩ শনিবার কাঁটাখালি গ্রামে তথ্যানুসন্ধান করে। নাম প্রকাশে

অনিচ্ছুক গ্রামের মানুষের দাবি, গত ২৪ শে আগস্ট, ২০২৩ সন্ধ্যার সময় কাঁটাখালি গ্রামের পুঠিয়া মোড় থেকে সাধারণ পোশাকে এক ভদ্রলোক বেলু শেখ-কে ডেকে নিয়ে জোর করে গাড়িতে তোলে। এলাকার কিছু লোক আটকানোর চেষ্টা করে, কিন্তু গাড়ি দ্রুত চলে যায়। পরে এলাকার লোক জানতে পারে, তিনি কোনও সাধারণ মানুষ নয়, রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসার। অ্যারেস্টের সময় বেলু শেখ'র কাছে কোন ধরনের আগ্নেয় অস্ত্র ছিল না।

গ্রামের মানুষ বলেছেন, বেলু শেখ অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে। সে বর্তমানে গ্রামে ছোলার ছাতুর হকারী করে। পিতা, মৃত বাদল শেখ গ্রামে ভিক্ষা করে সংসার চালাতেন। মা আনোয়ারা বেওয়াও গ্রামে ভিক্ষা করে খান। এরকম এক দরিদ্র সাধারণ ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আগ্নেয় অস্ত্র কেসে ফাসাচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। ক্ষোভে ফেটে পড়ে গ্রামের মানুষ। তাঁরা বলেন, বেলু শেখ'কে ছাড়া না হলে গ্রামের মানুষ বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টসহ বেলু শেখের ছবি দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ২ শাখা সদস্যরা তাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন ও ২৬ শে আগস্ট গ্রামবাসী সহ রঘুনাথগঞ্জ থানায় যাবে বলে ঠিক করেন। কিন্তু থানায় যাওয়ার আগেই রঘুনাথগঞ্জ থানা থেকে শাখা সভাপতির কাছে ফোন আসে ফেসবুক পোস্ট ডিলিট করার জন্য। শাখা সভাপতি অস্বীকার করেন। রঘুনাথগঞ্জ থানা বিষয়টা নিয়ে কথা বলার আবেদন করে। দিনের বেলায় কাজ থাকার দরুন রঘুনাথগঞ্জ শাখার সদস্যরা রাত্রি আটটার সময় প্রায় ৫০-৬০ জন এলাকার যুবক ও গ্রামবাসীর সাথে রঘুনাথগঞ্জ থানায় যায়।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর থানার অফিসার ইনচার্জ সকলের সামনে অ্যারেস্ট করার বিষয়টি নিয়ে ভুল স্বীকার করে। যত দ্রুত সম্ভব বেলু শেখ'কে জামিন করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেন। সাথে সাথে জামিন করার আগে পর্যন্ত বেলু শেখ'র মা যাতে ঠিকঠাক চলতে পারে তার জন্য তৎক্ষণাৎ ১৫ হাজার টাকা বেলু শেখের মার হাতে তুলে দেন এবং জামিন করানোর জন্য সমস্ত খরচের ব্যবস্থা থানাই করবে বলে জানান। এরপর রঘুনাথগঞ্জ দুই শাখার সদস্যরা থানা থেকে বেরিয়ে আসেন। ফেসবুক পোস্টও ডিলিট করে দেন।এখনও পর্যন্ত তাদের নেওয়া খবর অনুযায়ী জামিনের জন্য পুলিশের পক্ষ থেকেই উকিলের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করা হচ্ছে। আগামী ৮ ই সেপ্টেম্বর জামিনের সম্ভাব্য দিন জানিয়েছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে।

তথ্যানুসন্ধানে ছিলেন— নজরুল ইসলাম (শাখা সম্পাদক), জাকির হোসেন (সভাপতি), কার্যকরী কমিটির ৪জন সদস্য। সঙ্গে এলাকার বেশ কিছু মানুষো ছিলেন।

তথ্যানুসন্ধান: বহরমপুর শাখা মুর্শিদাবাদ জেলায় আবারও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ

অতনু ঘোষ, ২১ বছর বয়স, বহরমপুর কমার্স কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বাবা, নির্মল ঘোষ। ছোট মনোহারীর দোকান। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ব্লকের নিয়ালিশ পাড়া গোয়ালজান পঞ্চায়েতের বুন্দাইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। অতনুর বাবা-মা ও দিদির অভিযোগ বহরমপুরের সৈদাবাদ ফাঁড়ির পুলিশ হেফাজতে অতনুর মৃত্যু হয়েছে।

১১ ই আগস্ট বহরমপুর শাখা সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদকসহ এলাকায় তথ্যানুসন্ধানে করে।

তথ্যনুসন্ধানে অতনুর বাবা-মা ও দিদি বলেন, ৫ ই আগস্ট সকাল ১১ টা নাগাদ অতনু বহরমপুরের মনীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠের মাঠের উল্টোদিকে ভাগীরথী নদীর ধারে ফুটপাতের ওপর বটগাছের তলার ধাপিতে বসে মোবাইল দেখছিল। ওই সময় পুলিশ তাকে পুরনো একটা ঝামেলার জন্য ধরতে আসে এবং পুলিশের হেফাজতে নেওয়ার পর অতনু পালাতে গিয়ে ভয়ে পাশের ভাগীরথী নদীতে ঝাঁপ দেয়। পুলিশ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এবং অতনুকে পারে ঘেষতে দেয় না। অতনুকে বাঁচানোর চেষ্টাও করে না। শেষ পর্যন্ত, অতনু নদীতে তলিয়ে যায়। পরের দিন সন্ধ্যা ছটা নাগাদ অতনুর দেহ রাধার ঘাট থেকে উদ্ধার হয়। তাঁরা বলেন, প্রথমে বহরমপুর থানা জেনারেল ডায়েরি না নিতে চাইলেও পরে নেয়। জিডি নাম্বার ৪২৫, বহরমপুর থানা, ৫ই আগস্ট ২০২৩।

প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান থেকে বহরমপুর শাখা র দাবি

১. অবিলম্বে বহরমপুর থানার মৃত অতনুর পিতা নির্মল ঘোষের দাবি অনুযায়ী বহরমপুরের সৈদাবাদ ফারির তত্ত্বাবধায়ক অফিসারের বিরুদ্ধে বহরমপুর থানায় হত্যার মামলা রজু করতে হবে। দোষী পুলিশের শাস্তি দিতে হবে।

২. অতনু ঘোষের মৃত্যু নিয়ে জেলা বা হাইকোর্টের কোন বিচারকের তত্ত্বাবধানে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে।

৩.অবিলম্বে পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪. অতনু ঘোষের দিদি গ্রাজুয়েট। অবিলম্বে জেলা প্রশাসন বা রাজ্য প্রশাসনকে অনিন্দিতা ঘোষের জন্য একটা সম্মানজনক চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।

উক্ত বিষয় ও দাবিকে সামনে রেখে বহরমপুর শাখা প্রেস বিবৃতি দেয়। অতনু ঘোষের বাবা নির্মল ঘোষ বহরমপুরের এক প্রথিতযশা উকিলের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। উকিলের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার এসপির সাথে এলাকার বেশ কয়েকজনকে সাথে নিয়ে দেখা করেন ও নির্মল ঘোষের করা অভিযোগকে চ্জ্জট্ট হিসাবে গ্রহণ করার দাবি করেন। এসপি জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করা শুরু হয়েছে।

তথ্যানুসন্ধান: সামশেরগঞ্জ শাখা

খবরে প্রকাশিত, সামশেরগঞ্জে এক সিআইএসএফ জওয়ান মদ্যপ অবস্থায় তিনজন বাচ্চাকে নদীতে ছুড়ে ফেলে দেয়

খবরের কাগজে ও বিভিন্ন পোর্টালে প্রকাশিত হয় যে, গত ১৩ ই আগস্ট ২০২৩, এক সিআইএসএফ জওয়ান মদ্যপ অবস্থায় তিনজন বাচ্চাকে নদীতে ছুড়ে ফেলে দেয়। গত ১৪ই আগস্ট ২০২৩ সামশেরগঞ্জ শাখার সদস্যরা তথ্যানুসন্ধানে যান। ঘটনাটি ঘটে সামশেরগঞ্জের মালঞ্চঘাট সংলগ্ন এলাকায়। শামসেরগঞ্জ শাখার তথ্যানুসন্ধান টিমটি এলাকার বিভিন্ন লোক, ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা নৌকার মাঝি সহ অনেকের সাথে কথা বলেন। এলাকার লোক অসিত মন্ডল, মাঝি মীর শেখ, নাজির শেখ জানান, গত ১৩ ই আগস্ট ২০২৩, দুপুর দু'টো নাগাদ তিনজন বাচ্চা গঙ্গা নদীতে মাছ ধরা দেখছিল ও নিজেদের মধ্যে খেলছিল। ওই সময় এক সিআইএসএফ জওয়ান ঘাটে বসে মদ খেতে খেতে গান গাইছিলেন। তিনজন বাচ্চাও নিজেদের মধ্যে খেলতে খেলতে গান করছিল। হঠাৎ করে জওয়ানটি চেঁচাতে-চেঁচাতে বাচ্চা তিনটির হাত ধরে স্রোতের নদীতে ফেলে দেয়। বড় দুটি ছেলে কোনরকমে সাঁতরে তীরে চলে আসে, প্রাণে বেঁচে যায়। কিন্তু পাঁচ বছরের ছেলেটি ক্রমশ ডুবে যেতে থাকে। এলাকার দুজন লোক তৎক্ষণাৎ নদীতে ঝাঁপিয়ে সাঁতরে গিয়ে বাচ্চাকে বাঁচায়। দুটি ছেলের বাবার নাম আনিকুল শেখ ও একটি ছেলের বাবার নাম বশির শেখ। এরা সকলেই মালঞ্চ ঘাট সংলগ্ন গ্রামে থাকেন।

ঘটনার পরেই এলাকার লোক সামশেরগঞ্জ থানায় খবর দেয়। থানা থেকে লোক এসে মদ্যপ সিআইএসএফ জওয়ানকে নিয়ে যায়। দুর্যোগের থাকার জন্য সামশেরগঞ্জ শাখার সদস্যরা তথ্যানুসন্ধান সেরে আর সামশেরগঞ্জ থানায় যেতে পারেন না। তাঁরা থানার অফিসার ইনচার্জকে ফোনে যোগাযোগ করেন। উক্ত সিআইএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে বাচ্চাদের খুন করতে যাওয়ার মামলা রুজু করার দাবি জানান। থানার অফিসার ইনচার্জ অনুসন্ধান করে কেস করবে বলে আশ্বস্ত করেন।

তথ্যানুসন্ধানে ছিলেন— হায়দার আলি (শাখা সভাপতি), ও কার্যকরী কমিটি'র তিনজন সদস্য।

জয়নগর শাখার তথ্যানুসন্ধান

আপনারা জানেন যে রাজ্য সরকার ৮২০৭ টি স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারমধ্যে দঃ ২৪ পরগনার কুলতলির মৈপিট এর সাতটি স্কুল বন্ধ হবে। কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি পথকে প্রশস্ত করতে রাজ্যের মদত পরিষ্কার। আর তার মধ্যে দিয়ে কম-বেশি ৩০ হাজার স্কুলের মাস্টারমশাই-এর পদ লুপ্ত হয়ে যাবে। বেসরকারী স্কুল গজিয়ে তোলার, বলা যায় তাদের মদত দেওয়ার পরিকল্পনা। এবং পুরো সমাজকে শিক্ষার আলো না-দেখিয়ে তাদেরকে মূর্খ করে দেওয়া হলে রাজনীতি করা সহজ হবে।

৩ আগষ্ট,২০২৩, কুলতলির ময়রার চক বিদ্যাসাগর এফ পি স্কুলে এপিডিআর (APDR) জয়নগর শাখার আমরা তথ্যানুসন্ধান করতে যায়। তথ্যানুসন্ধানে বাস্তব, করুন এক চিত্র ফুটে উঠেছে। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কম দেখিয়ে স্কুল গুলিকে বন্ধ করা- এটি পরিকল্পনা মাফিক দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের পরিকাঠামো ধ্বংস করা হয়েছে। তার ফলে ছাত্রদের সংখ্যা কমছে, এটাই স্বাভাবিক। এমনতর পরিস্থিতিতে, অন্য কেউ বেসরকারি স্কুলে পড়তে চলে গেলে বাকি ছাত্রদের সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে এটা কোন যুক্তি।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার, প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের, কুলতলির ময়রার চক বিদ্যাসাগর এফপি স্কুলে যেতে গিয়ে দেখলাম, ময়রার চকটা পুরা একটা ছোট্ট নদী দিয়ে পরিবেষ্টিত। মাস্টারমশাই-কে স্কুলে আসতে গেলে গ্রামবাসীর তৈরি বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে আসতে হয়। মাটির রাস্তা বর্ষা কালে আধাঘন্টা কাদামাখা পথ ধরে, মানে কোথাও ফিসারির ভেড়ির পার বেয়ে যেতে হয়। রাস্তা বলে কিছু নেই। দুজন মাষ্টারমশাই। ৪০ জন ছাত্র নিয়ে স্কুল চলে। বাথরুম নেই, রান্না ঘরের ছাউনি নেই। বাচ্চাদের 'মিড মিলে'র রান্না হয় স্কুলের সাকুল্যে দু'টি ঘরের,

একটি ঘরে। বিদ্যুৎ নেই পাঁচ বছর ধরে পোষ্টার পড়ছে। লোকজন বলছেন— এমএলএ সাহেব বলেছেন, কিছু দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

গ্রামের লোকজনের কথা স্কুল বন্ধ হলে গরিব অভাবী বাচ্চারা আর দূরের স্কুলে, মানে প্রায় ১ ঘন্টা নদী পার হয়ে পড়তে যাবে না। এলাকায় শিক্ষিত ছেলেমেয়ে বলে আর-কিছু থাকবে না। আমরা চাই, স্কুল বন্ধ না-হোক। একজন বয়স্ক দাদুর কথায়, এই ছোট দোকানটা বাচ্চার খাবার কেনে, স্কুল বন্ধ হলে আমার দোকানটাই বন্ধ হয়ে যাবে।

তথ্যানুসন্ধানে ছিলেন— মিঠুন মন্ডল, আরিফুর খান।

রিপোর্ট

রিপোর্ট: বেলঘরিয়া-নিমতা শাখা

গত ৩০ শে জুলাই, ২০২৩, তারিখে এপিডিআর বেলঘরিয়া -নিমতা শাখার বর্দ্ধিত কার্যকরী কমিটির মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—

২) গত ১২ ই আগষ্ট, ২০২৩ সমিতির ৯ জন সদস্য'র উপস্থিতিতে দক্ষিণেশ্বর দোলপিড়ি ও আদ্য পিঠ মন্দির সংলগ্ন এলাকায়, সাম্প্রতিক মণিপুর ও হরিয়ানায় পরিকল্পিত জাতি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে, রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবাধ রিগিং, সন্ত্রাস, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ , সাতান্ন জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং সমসাময়িক নানা অসাংবিধানিক আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে শতাধিক পোষ্টারের মাধ্যমে প্রচার ও লিফলেটিং করা হয়।

৩) গত ২০, আগষ্ট, ২০২৩, রবিবার, বেলঘরিয়া-নিমতা শাখার উদ্যোগে সাম্প্রতিক মণিপুর, হরিয়ানায় পরিকল্পিত জাতি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবাধ রিগিং, সন্ত্রাস, রক্তপাত ও সাতান্ন জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে, এবং সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং ও কিশোরের মৃত্যুর প্রতিবাদে, ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবিতে দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপিঠ মোড়ে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদী বক্তব্যে পাশাপাশি বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের আবৃত্তি, ও গণ-আন্দোলনের অকৃত্রিম সাথী শুভঙ্কর মুখার্জির (জর্জ মির্জাফর গোস্বামী) গানের বলিষ্ঠ ভাষ্যে সভা এক অনন্য মাত্রা গ্রহণ করে। বয়স ও অসুস্থতা— তাঁর অদম্য আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তির কাছে পরাজিত হয়! তাঁর এই দিনের সভার ভূমিকায় আমরা উদ্বেলিত, অনুপ্রাণিত।

এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন, বরুণ দাস, জগদীশ সর্দার, সোমনাথ বসু, ও অন্যান্যরা। সভায় উল্লেখযোগ্য মনোগ্রাহী ও অসাধারণ বক্তব্য রাখেন অরিজিৎ গাঙ্গুলি।

উল্লেখযোগ্য, সভা চলাকালীন আমাদের সাথে যোগাযোগের জন্য ৪ জন ফোন নং নিয়ে যান। শ্রোতাদের অনেকেই এগিয়ে এসে আমাদের বক্তব্য ও এমন সভার আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানান। মাইকের শব্দদূষণে ব্যবসায় ক্ষতি হওয়া স্বত্বেও পাশের এক স্টেশনারি দোকানের মালিক আমাদের সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহার করেন।

প্রায় ১৫ বছর পর ঐ অঞ্চলে আমাদের ঐ সভা সংগঠিত করতে পারায় আমার খুবই উৎসাহিত হলাম।

এপিডিআর সোনারপুর শাখার আয়োজনে একটি বিশেষ আলোচনা সভা

সাম্প্রতিক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য সামাজিক ঘটনা নিয়ে এলাকার সহনাগরিক এবং মানবাধিকার কর্মীদের সচেতন করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এপিডিআর সোনারপুর শাখা সোনারপুর কফি হাউসে গত ১৯ অগাস্ট, ২০২৩ আয়োজন করেছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা। আলোচনা সভার আলোচ্য বিষয় ছিল দুটি—

১) মণিপুরে জাতি সংঘাত, এবং ২) অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC)

আলোচনা সভার সভাপতি ছিলেন এপিডিআর সোনারপুর শাখার সভাপতি গালিব ইসলাম এবং সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন এপিডিআর সোনারপুর শাখার সহ সভাপতি সরোজ বসু।

প্রথম বিষয়ের বক্তা ছিলেন ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা, অনিন্দিতা ঘোষাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে মণিপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সাথে সেখানকার জনজীবনের ইতিহাসের প্রসঙ্গ তুলে একটি সার্বিক ভাষ্য উপস্থাপন করেন। একসময়ে মণিপুরের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে তিনি যে সেখানকার ইতিহাস চর্চার ও গবেষণার বিষয়ে আগ্রহী হয়েছেন, সেটাও তিনি জানান। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালের পরে 'সেভেন সিস্টার্স' তৈরি হওয়ার পর জাতিগত সংঘর্ষ বলে একটা শব্দ এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের

রাজ্যগুলোর অস্তিত্বের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি মণিপুরের জনবিন্যাস ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে এবং সাম্প্রতিক হিংসা শুরুর প্রাথমিক কারণগুলি সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেন। তাঁর ভাষায়, মেইতেইরা মণিপুরের মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ হয়েও বসবাস করে রাজ্যের ১০ শতাংশ সমতল জমিতে। মণিপুর ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী মেইতেইরা পাহাড়ে জমি কিনতে পারে না। ধর্মের দিক থেকে মেইতেইরা হিন্দু আর জনজাতি সম্প্রদায়গুলো অধিকাংশই খ্রিস্টান।

শুধু জাতিগত বা ধর্মগত দিক থেকে এই সংঘর্ষের কারণ ব্যাখ্যা করা যাবে না। ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে, হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর, মেইতেইরা ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়, মূলত দুটো বর্ণে বিভাজিত হয়। এ ছাড়া আছে লোই বা যারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেনি। মণিপুরে এরা তফসিলি জাতি বলে গণ্য হয়। মণিপুর অঞ্চল সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি ছিল, সমতলের কোনও আইনকে জনজাতিদের জীবনযাপনের শর্ত হিসাবে আরোপ না-করা। কুকিরা ছিল যোদ্ধা জাতি। এরা বারুদ বানাতে ও বন্দুক চালাতে পারত। তাই ঔপনিবেশিক সময়ে বর্মা আর মণিপুরের মধ্যে ব্রিটিশরা মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলে কুকি কলোনী তৈরি করেছিল। কুকিরা মণিপুরের রাজাকে কর দিত না, সেনাবাহিনীতে কাজ করত।

মণিপুরে অসম, মেঘালয় ও অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা বাঙালি মুসলমান, বিহারিরা দক্ষ শ্রমিক বলে মেইতেইরা তেমন কাজ পেত না। মায়ানমারের অশান্ত পরিস্থিতির কারণে সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে কুকি, নাগা, পাইতেই, চিংরা মণিপুরে ঢুকে পড়ত প্রায়ই। রাজ্যের ব্যবসায় প্রাধান্য পেত অ-মণিপুরিরা বিশেষত মারোয়াড়িরা। বহিরাগতদের আটকানোর জন্য মেইতেইরা মণিপুরে 'ইনার লাইন পারমিট' চালু করার দাবি করে। কিন্তু মণিপুর জনজাতি-অধ্যুষিত রাজ্য না বলে তৎকালীন সরকার এই দাবি মেনে নেয়নি। বিজেপি আমলেই মণিপুরে ইনার লাইন পারমিট চালু হয়। এতে শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষরাই না, কুকিদের মতো আরও অনেক জনজাতিদের মণিপুরে বাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরবর্তী বিষয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা UCC বিষয়ে বক্তা ছিলেন প্রাবন্ধিক ও সেস্টাস-এর সম্পাদক অশোক মুখোপাধ্যায়। তিনি বর্তমান বিজেপি সরকারের অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার তৎপরতাকে তাদের হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণের নাৎসিবাদী প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। সম্প্রদায়ের পারসোনাল ল বা দেওয়ানি বিধি যদি মানবতা বিরোধী বা সেকেলে হয়, তাহলে তা পরিবর্তনের দাবি উঠবে সেই সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে। বাইরে থেকে বিধি চাপিয়া দিলে দেশের বহুত্ববাদী ধারণায় প্রবল আঘাত পড়বে, আর ঠিক সেটাই করতে চাইছে বর্তমান হিন্দুত্ববাদী সরকার। এ পি ডি আর সহ সমস্ত মানবাধিকার সংগঠনের উচিৎ সর্বতভাবে এই অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করা।

দুটি বিষয়ের বক্তব্যের শেষেই একটি করে উপস্থিত শ্রোতাদের জন্য প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল।

APDR দঃ২৪পঃ জেলা কমিটির বিগত কর্মসূচি

৮/৪/২০২৩ গড়িয়া শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গড়িয়ার প্রগতি পাঠভবনে।

১৬/৪২০২৩, গোচরণ-দঃ বারাসাত শাখার পথসভা। বক্তাঃ রঞ্জিত শূর, নিশা বিশ্বাস, শাহানারা খাতুন, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

২৩/৪/২০২৩, গোচরণ দঃ বারাসাত শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৪/৪/২০২৩ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে নরেন্দ্রপুর থানায় লক আপ হত্যার বিরুদ্ধে, দোষী পুলিশ আধিকারিকদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বারুইপুর পুলিশ জেলার এসপি-কে বিক্ষোভ সহ ডেপুটেশন।

১৯/৫/২০২৩, নরেন্দ্রপুর থানা লক আপে হত্যার বিরুদ্ধে, দোষী পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় মামলা দায়ের করে গ্রেপ্তারের দাবিতে বারুইপুর রেল গেটের কাছে প্রতিবাদ সভা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগ।

২১/৫/২০২৩, কাকদ্বীপ শাখার সম্মেলন। প্রস্তুতি কমিটি থেকে পূর্নাঙ্গ শাখায় রূপায়িত হলো। সভাপতি নির্বাচিত হলেন শংকর দাস ও সম্পাদক হলেন নারায়ণ সামন্ত।

১/৬/২০২৩, নিগৃহীত ভারতীয় কুস্তিগীরদের স্বপক্ষে ডায়মন্ড হারবার শাখার উদ্যোগে মিছিল সহ প্রচার অভিযান, ডায়মন্ড হারবার শহরে।

৩/৬/২৩, বালেশ্বরের ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে যাত্রী নিরাপত্তার দাবিতে সোনারপুর স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ। উদ্যোগে এপিডিআর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি।

৬/৬/২০২৩, বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে বজবজ থানায় ডেপুটেশন।

২৩/৬/২০২৩, জয়নগর শাখার উদ্যোগে রেল হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জয়নগর ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় প্রতিবাদ সভা। বক্তব্য রাখেনঃ রঞ্জিত শূর, পলাশ মেহেদী, দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, মিঠুন মন্ডল, আলতাফ আমেদ, সঞ্চিতা আলী প্রমুখ।

৮/৮/২০২৩, পঞ্চায়েত নির্বাচনে বলগাহীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, মণিপুরের জাতি দাঙ্গায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীরাবতার বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবার শহরে মিছিল ও মিছিল শেষে পথসভা। বক্তাঃ রঞ্জিত শূর, দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, শংকর দাস, সামসুর আলম, শাহানারা খাতুন প্রমুখ। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন মহাব্বত হোসেন ও কবীন্দ্র ব্যানার্জী।

২৬/৮/২০২৩, এপিডিআর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে সুন্দরবনের মানুষের জীবন জীবিকার সংগ্রাম, কর্পোরেট আগ্রাসন বিষয়ে জানা বোঝার জন্য আলোচনা সভা— 'সঙ্কটে সুন্দরবনের মানুষ'। বক্তব্য রাখেন অনিমেষ সিনহা, স্বপন মন্ডল, অনাথ মৃধা, গোবিন্দ প্রধান। আলোচনার শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব বেশ জমে ওঠে।

৮/৬/২০২৩, ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে যাত্রী নিরাপত্তার দাবিতে অভিন্ন দেওয়ানী বিধির বিরুদ্ধে, বেহালায় মিছিল ও পথসভা। এপিডিআর বেহালা শাখার উদ্যোগে।

রিপোর্ট: গাজোল শাখা

গত ৭ আগষ্ট, ২০২৩, বিকেল পাঁচটায় মালদা জেলার, এ পি ডি আর গাজোল শাখা, গাজোল শহরের জনবহুল 'বিদ্রোহী মোড়'-এ মণিপুরে রাষ্ট্রীয় মদতে জাতিদাঙ্গা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে হিংসার প্রতিবাদে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ঐ পথসভায় শ'খানেক মানুষ আমাদের বক্তাদের কথা শোনেন।

রিপোর্ট: কৃষ্ণনগর শাখা

নির্বাচনী সন্ত্রাস , ইউ সি সি এর বিরুদ্ধে ২৫ শে জুলাই কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতাল মোড়ে, অফিস মোড়ে পথসভা হয়। জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ভোট দিতে না-দেওয়া থেকে শুরু করে ভোট গণনা ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর যে সন্ত্রাস নামানো হয় তার বিরুদ্ধে প্রেস বিবৃতি ও তথ্যানুসন্ধান করা হয়।

ইউ সি সি , নির্বাচনী সন্ত্রাস এবং যাদবপুরের ছাত্র আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে ছাত্রসমাজের ওপর রাজনৈতিক দলগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে ১৬ ও ১৭ আগস্ট দু'দিনব্যাপী শহরজুড়ে প্রচারাভিযান হয়। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সমিতির অবস্থান, লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলিতে অবিলম্বে র‍্যাগিং বন্ধ করতে, কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় হওয়ার দাবির পাশাপাশি স্বপ্নদীপ আত্মহত্যায় প্ররোচিত করায় অভিযুক্ত ছাত্রদের শাস্তির দাবিও রাখা হয়।

জাতীয় সড়ক সম্প্রসারনের জন্য কৃষ্ণনগর পৌরসভার ২৫ নং ওয়ার্ডের চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশটি পরিবারের উচ্ছেদ হওয়ার বিরুদ্ধে ডি এম ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং তার আগে তথ্যানুসন্ধানে যাওয়া হয়। ডেপুটেশনে উচ্ছেদ হতে যাওয়া বাসিন্দাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ ও যুক্ত করা হয়।

রিপোর্ট: নবদ্বীপ শাখা

মণিপুরে জাতিদাঙ্গা ও ইউ সি সি এর বিরুদ্ধে ২৬ শে জুলাই, ২০২৩, রাধাবাজার মোরে পথসভা করে নবদ্বীপ শাখা।

রিপোর্ট: সি ডি আর ও মিটিং

২৩ আগষ্ট, ২০২৩ প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া, দিল্লীতে সি ডি আর ও সভা সম্পন্ন হলো।

এই সভায় উপস্থিত সংগঠনগুলি ছিল— ১) পি উ ডি আর (দিল্লী), ২) এ পি ডি আর (পঃ বঃ), ৩) এ সি আর এ (আসানসোল), ৪) সি পি ডি আর (তামিলনাড়ু), ৫) এম এ এস এস (আসাম) ৬) সি এল সি (অন্ধ্র), ৭) সি এল সি (তেলেঙ্গানা), ৮) জে সি ডি আর (ঝাড়খন্ড) ৯) এ এফ ডি আর (পাঞ্জাব)।

রিপোর্ট: কালনা শাখা

গত ২১ আগষ্ট ২০২৩ কালনা-সমুদ্রগড় শাখার দ্বিতীয়, দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। সমুদ্রগড়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সবেলা ১১'টা থেকে। সম্মেলনে ১৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে আগামী দু'বছরের জন্য নতুন কমিটি তৈরী হয়।

সভাপতি— বাসুদেব বিশ্বাস, সহ-সভাপতি— উত্তম দেবনাথ, সম্পাদক— অলোক দেবনাথ, কোষধ্যক্ষ— বিদ্যুৎ

বালা, রতন দেবনাথ।

কালনা রেল ষ্টেশন সংলগ্ন রেলের জমিতে থেকে দীর্ঘ্য দিনের বাসিন্দাও ও দোকান উচ্ছেদর নোটিশ দিয়েছে, রেল দপ্তর। অধিবাসীরা আন্দোলন শুরু করেছে। জীবিকা ও বাসস্থানের অধিকারের পক্ষে কালনা-সমুদ্রগড় শাখা এই অন্দোলনে সহয়তা দিচ্ছে।

রিপোর্ট: ডোমকল শাখা

মুর্শিদাবাদ জেলার এপিডিআর ডোমকল শাখা সম্মেলন গত ১৫ ই জুলাই ২০২৩, ডোমকল বাবলাবোনার একটি হল ঘরে সকাল ১১ টা থেকে এপিডিআর ডোমকল শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষ থেকে দুইজন পর্যবেক্ষক, আব্দুল হামিদ সরকার এবং রাহুল চক্রবর্তী সম্মেলনে উপস্থিত ছিল।

সম্মেলনে প্রতিনিধি, শুভানুধ্যায়ী ও স্বেচ্ছাসেবক সহ মোট ৫০ জন জন উপস্থিত ছিলেন। শহীদ স্মরণের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন এলাকার গায়ক মুন্না সরকার। প্রতিবেদন পাঠ করেন শাখার বিদায়ী কমিটির সভাপতি মতিউর রহমান। প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন মোট এগারো জন। সর্ব সম্মতিতে মোট এগারো জনকে নিয়ে শাখার কার্যকারী কমিটি গঠিত হয়।

সম্মেলনের শেষে সম্মেলন কক্ষ থেকে প্রায় এক কিমি রাস্তা মিছিল করে শাখা সদস্য ও এলাকার সাধারণ মানুষ। এরপর ডোমকল ব্রীজ মোড়ে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি ও সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ'র অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং বন্দুকের নলের ডগায় সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিরোধিতা করে সম্মেলনের পর প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন সদ্য সমাপ্ত সম্মেলনে নির্বাচিত সভাপতি মতিউর রহমান ও সম্পাদক আব্দুল গনি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রাহুল চক্রবর্তী। গণসংগীত পরিবেশন করেন শাখা সম্পাদক আব্দুল গণি।

রিপোর্ট: মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে বহরমপুরে নাগরিক মিছিল

প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মণিপুরে পরিকল্পিত জাতি দাঙ্গার বিরুদ্ধে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে বহরমপুরে নাগরিক মিছিল সংগঠিত হল।

মনিপুরের ঘটনা আসলে গুজরাত মডেল, যার মাধ্যমে সংখ্যাগুরু মেইতিরা ভয় দেখিয়ে সংখ্যালঘু কুকি-জো ও অন্যান্য আদিবাসীদের জল, জঙ্গল ও জমি লুঠ করতে উদ্যত। এতে মদত দিচ্ছে মনিপুর সরকার ও ভারত সরকার। পাহাড় জঙ্গলের নিচের খনিজ সম্পদ লুটই তাদের মূল লক্ষ্য।নিরীহ জনগণের উপর বর্বর আক্রমণ, তাদের ঘর-বাড়ি, উপাসনাস্থলের উপর আক্রমণ, মহিলাদের ধর্ষণ, খুন, বিবস্ত্র করে প্যারেড করানো সবই হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর ২০০২ সালের গুজরাট মডেলকে সামনে রেখে। কুকিদের স্বাভাবিক আবাস্থল পাহাড় জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ করে সেই এলাকা দখল করার জন্য মণিপুর রাজ্যসরকার এবং তার তৈরী সহযোগী সংস্থাগুলি নানাবিধ প্রচেষ্টা নিয়েছে, যেমন- মেইতিদের এস.টি স্ট্যাটাস দেওয়ার নামে বিচারালয় ও আইনসভাকে ব্যবহার করা। এছাড়াও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর ক্রমাগত কুকিদের মাদক উৎপাদক ও পাচারকারী বলে মনিপুরের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা ও শেষ পর্যন্ত মেইতি -কুকিদের সংঘর্ষ বাধিয়ে দিলেন।

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মনিপুর নিয়ে পাশ কাটানো মনোভাব মনে করিয়ে দেয় ঠিক কিভাবে ২০০২ সালে গুজরাটে মোদীর মূখ্যমন্ত্রিত্বের সময়ে সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় দাঙ্গাবাজ গণহত্যাকারীদের দিনের পর দিন ছাড় দেওয়া হয়েছিল।

গুজরাট মডেলকে দেশের ও জনগণের জন্য বিপদজনক মনে করছে মুর্শিদাবাদের নাগরিকগণ। এর মাধ্যম্যে বিজেপি-আর.এস.এস ঔপনিবেশিক 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতি দিয়ে জনসাধারণকে নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে দেশের জল জঙ্গল জমি লুঠ করে তা বৃহৎ কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে চাইছে।

মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৈফিয়ৎ চাইছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে মনিপুর নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছে।

উক্ত বক্তব্যকে হাতিয়ার করে ২৬ শে জুলাই ২০২৩ এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে নাগরিক মিছিলে ও সভায় বক্তব্য রেখেছেন, আবৃত্তি ও গণসংগীত করেছে জলাভূমি রক্ষা কমিটির আহবায়ক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মুর্শিদাবাদের নাগরিকবৃন্দ। প্রত্যেকেই নিজেদের

উদ্যোগে গান করেছেন, আবৃত্তি করেছেন ও অত্যন্ত প্রাণবন্ত ভাবে মিছিলে ও সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। আগত প্রত্যেক সাংবাদিককে মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে নাগরিকদের পক্ষ থেকে উপরিউক্ত বক্তব্যকে ঘিরে একটি করে প্রেস বিবৃতিও দেওয়া হয়।

রিপোর্ট: মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির প্রতিবাদ-প্রতিরোধ

মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার হেফাজতে গোবিন্দ ঘোষ হত্যার বিরুদ্ধে এলাকার জনসাধারণের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ হয়েছে, এপিডিআর মুশিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে।

পুলিশ কোড বা দেশের সংবিধানে অনেক পদ্ধতির কথা লেখা থাকলেও কিছুই মানা হয় না। তিন দিন ধরে পুলিশ হেফাজতে অকথ্য অত্যাচার করে গোবিন্দ ঘোষ'কে হত্যা করা হয়। থানা থেকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয় বটে, কিন্তু ডাক্তাররা জানায় গোবিন্দ মৃত। এলাকার মানুষের অভিযোগ, পুলিশ সংগঠিতভাবে খুন করেছে গোবিন্দকে।

আইনে অ্যারেস্টের করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি আছে। নানা গল্পকথা বলা হয়। অ্যারেস্ট মেমো দেওয়ার কথা বলা হযয়েছে, লকআপে বন্দিকে পেটানোর বিরুদ্ধে বলা হযয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে তোলার কথা বলা হয়েছে, এমন-কী জেরা করার সময় সিসি টিভি কথাবলা হয়েছে। অথচ, কেউ কিছুই মানেনা। নানা মামলাও হয়। ২২-২৫ বছর ধরে চলে। অভিযোগকারী মরে যাওয়ার পরেও মামলার নিষ্পত্তি হয়না।

নবগ্রামের মানুষ এটা বুঝেছে। পথ দেখিয়েছে মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের মানুষ। তারা সংগবদ্ধ প্রতিবাদ করেছে। তারা বুঝেছে, একজনের জন্য পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু সবাইকে নামতে হবে। কারণ, আইনের শাসন আর নেই এই রাজ্যে।

ঘটনার প্রাথমিক তথ্যনুসন্ধানের পর ৬ ই আগস্ট প্রেস বিবৃতি ও ৭ই আগস্ট ২০২৩ এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি মুর্শিদাবাদের এসপি'কে ডেপুটেশন দেয় নিম্নলিখিত দাবির ভিত্তিতে।

১) নবগ্রাম থানর হেফাজতে গোবিন্দ হত্যায় শুধু সাসপেন্ড নয়, অভিযুক্ত ওসি ও তদন্তকারী অফিসারকে খুনের ধারায় অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে বিচার শুরু করতে হবে। কারণ, তাঁরা পিটিয়ে খুন করায় অভিযুক্ত।

২) মৃত গোবিন্দ ঘোষের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩) থানাগুলোর এই সংগঠিত গুন্ডাগিরিকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

ঘটনা

দিনমজুর গোবিন্দ ঘোষ, ২৫ বছরের তরতাজা যুবক। বাবা ষষ্ঠী ঘোষ। নবগ্রাম ব্লকের সিঙ্গার গ্রামের বাসিন্দা। গত ২ আগস্ট,২০২৩ বুধবার রাত্রি আটটা নাগাদ নবগ্রাম থানার পুলিশ গোবিন্দর খোঁজে যায়। গোবিন্দ তখন ঘরে ভাত খাচ্ছিল। এলাকায় চুরির অভিযোগে পুলিশ গোবিন্দকে তুলে নিয়ে যায় নবগ্রাম থানায়। পরের দিন, বৃহস্পতিবার তাকে ছেড়ে দেবার কথা ঘরের লোককে মুখে বললেও পুলিশ তাকে ছাড়েনি এবং কোর্টেও তোলেনি। পরিবারসহ এলাকার লোকের অভিযোগ, বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত নবগ্রাম থানার হেফাজতে গোবিন্দকে পালা করে পেটানো হয়। শুক্রবার রাতে গোবিন্দর দুই দাদাসহ আরও গ্রামের লোক থানার বাইরে থেকে গোবিন্দর চিৎকার শুনতে পায়। তখনও তাকে পিটিয়ে চলেছে পুলিশ। তিন দিন ঘরের কাউকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। গ্রামের লোকের বহু অনুরোধেও বন্ধ হয়না পুলিশের লাঠি। কিছুক্ষণ পর গোবিন্দর জন্য জল নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেই জল গোবিন্দ আর খেতে পায়নি। থানার লকাপেই গোবিন্দ মারা যায়। প্রতিবাদ প্রতিরোধে ফেটে পড়ে এলাকার মানুষ। গ্রামবাসী থানা ঘেরাও করে। শুরু হয় পুলিশের সাথে বচসা। পুলিশের লাঠি চলে। এলাকার মানুষ আহত হয়। পাল্টা প্রতিরোধে নামে এলাকার জনসাধারণও।

নবগ্রাম থানাতেই পুলিশের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে গোবিন্দ ঘোষের পরিবার। ডিএসপি পদমর্যাদার একজনকে তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে, পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে বিষয়টি আত্মহত্যার কেস হিসাবে সাজানোর।

জানা গেছে, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ নবগ্রাম থানার আই সি সাস্পেন্ড হয়েছেন।

এপিডিআর-এর সমস্ত শাখার কাছে রিপোর্ট পাঠানোর আহ্বান রইল।

রিপোর্ট: চারণকবি গদর

"আগ হ্যায়, ইয়ে আগ হ্যায়
ইয়ে ভুখা পেটকি আগ হ্যায়..."

অমর গদর স্মরণে এপিডিআর বহরমপুর শাখার উদ্যোগে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

১৯৪৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের এক গরীব দলিত পরিবারে জন্ম, মৃত্যু ৬ ই আগস্ট ২০২৩।

গদর মানেই জনতার গান। গদর মানেই শোষিত নিপীড়িত কোটি কোটি জনসাধারণের অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার ভাষা। গদর হল প্রজা গায়কুডু। মানে, প্রজাদের গায়ক। অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানাসহ সারা দেশের আপামর নিপীড়িত মেহনতী জনসাধারণের দেওয়া নাম। সাধারণ দলিত আদিবাসী জনগণের ওপর বর্ণবাদী রাষ্ট্রীয় হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো প্রজা গায়কুডুর গান। শুধু গান নয়, গানের সাথে-সাথে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সারা শরীরের শানিত ঝলকানি।

পারিবারিক সূত্রে পাওয়া নাম গুম্মাদি ভিত্তল রাও গেল হারিয়ে। প্রজা গায়কুডু পরিণত হলো সারাদেশের কোটি কোটি জনতার প্রিয় - গদরে। উর্দু ভাষায় যাকে বলে বিপ্লব।

জনতার প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াই, ব্যথা-বেদনা -যন্ত্রণা, চোখের জল থেকে বেরিয়ে আসা প্রতিস্পর্ধার আকাঙ্ক্ষা, নানা ধরনের জীবন জীবিকা থেকে বেরিয়ে আসা সুর ভাষা জোগাতো গদরের গানে।

গত ১৯ শে আগস্ট ২০২৩ বৈকাল ৫ টা থেকে বহরমপুরের রবীন্দ্র সদনের সামনে সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে ঘিরে প্রকাশ্যভাবে বিপ্লবী গণশিল্পী গদর স্মরণে এক প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজন করল এপিডিআর বহরমপুর শাখা। গদর স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করার পর অনুষ্ঠান শুরু করেন স্বনামধন্য বাউল শিল্পী লালু ফকির। মানুষের ঢল নামে অনুষ্ঠানে। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা শ্রমিক কৃষক ও সাংস্কৃতিক মনস্ক মানুষের সাথে সাথে বহরমপুরের সাধারণ শ্রমজীবী জনগণ সহ নানান সংস্কৃতিক সংগঠন, কবি, ও সাহিত্যিক, শিল্পী, নাটকের সংগঠন সহ পথ চলতি ব্যাপক নাগরিক জমা হয় প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচিটিতে। মুর্শিদাবাদ জেলার অগ্রগণ্য আবৃত্তিকার অভিজিৎ সরকার একটি অসাধারণ সময়োপযোগী আবৃত্তি করেন। গদরের গানের বঙ্গানুবাদের কথাকে আবৃত্তির ভাষায় অসাধারণ উপস্থাপন করেন টুম্পা ঝাঁ। গণসংগীতে মাতিয়ে দেয় ৭০ দশকের গণসংগীত শিল্পী অমিতেশ তুবি সরকার ও মুর্শিদাবাদের অগ্রগণ্য গণসংগীত শিল্পী বাপ্পা চক্রবর্তী। এছাড়াও কোরাসে গণসংগীত করে কান্দির একটি গ্রাম মহলন্দী থেকে আসা মহলন্দী ইস্টার্ন ক্লাবের আজকের সময়ের ছেলে মেয়েরা। বক্তব্য রাখেন, নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন থেকে উঠে আসা একদা বিপ্লবী লেখক শিল্পী সংঘের (Revolutionary writers Association) সদস্য ও বাসভূমি পত্রিকার সম্পাদক অরূপচন্দ্র। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আবরার হোসেন ও শেখর দত্ত। তিনজনাই গদরের সাথে কাটানো সময়ের কথা বলে বলেন। বলেন বর্তমান সময়ে গদরের প্রয়োজনীয়তার কথা।

এপিডিআর বহরমপুর শাখার পক্ষ থেকে আলোচনায় উঠে আসে কেন আজকে গদর স্মরণ?

আজও যখন সারা দেশ ও রাজ্যের সাথে সাথে মুর্শিদাবাদের সাধারণ বঞ্চিত জনগণের অর্জিত সমস্ত অধিকার শাসকের চোখ রাঙানীর সামনে পড়ে, এনআরসির নামে যখন জেলার ঘাম রক্ত ঝরানো অগণিত কৃষক জনগণের নাগরিকত্বকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়, তখনই জনগণের অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গদরের প্রয়োজন হয়। জেলার সীমান্তবর্তী মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ করার ন্যূনতম অধিকারও রাষ্ট্রীয় বাহিনী বিএসএফ যখন কেড়ে নেয়, বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় সাধারণ গরিব মুসলিম পরিবারগুলোতে যখন এনআইএ'র আক্রমণ নেমে আসে তখন সাধারণ গরিব মানুষকে অধিকারের লড়াইয়ে সংগবদ্ধ করার জন্য প্রতি এলাকায় এক একজন গদরের মত শানিত তরবারির প্রয়োজন হয়।

কৃষকদের অসম্মতিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ফারাক্কার এক হাজার বিঘা আম লিচু বাগানকে যখন কর্পোরেট হাঙ্গর আদানির স্বার্থে ধ্বংস করা হয় ও প্রতিবাদ প্রতিরোধে শামিল অগণিত কৃষক ও মহিলাদের ওপর শয়ে শয়ে পুলিশ লাঠি হাতে হায়নার মত হামলে পড়ে, তখন এই প্রতিবাদী কৃষক জনগণকে নিজেদের অধিকার কায়েম রাখার লড়াইয়ে শক্তি যোগানোর জন্যই বিপ্লবী গণশিল্পী গদরের একদা গেয়ে ওঠা গান আবারও সামনে চলে আসে—

''দিনের আলোয় ওরা মেরে গেল তোমাদের, যেন পাখি শিকারের খেলা ..... বসে বসে কাঁদছো মালান্না?

খাপ খোলা তলোয়ার হও মাদীগান্না .....”

সবশেষে বিপ্লবী গণশিল্পী গদরকে নিয়ে প্রকাশ্যে প্রজেক্টারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের একটি অডিও ভিজুয়াল তথ্যচিত্র সকলকে দেখানো হয়। গোটা সভাটি সভাপতি মন্ডলী হিসাবে পরিচালিত করেন বহরমপুর শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সভাপতি নিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ শাখার সভাপতি ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি হামিদ সরকার। এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক গোলাম মোঃ আজাদ ও বহরমপুর শাখার সদস্যবৃন্দসহ জেলার বিভিন্ন শাখা থেকে আগত সদস্যরাও সভাটিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বহরমপুর শাখা পক্ষ থেকে একটি গদর স্মরণ নিয়ে একটি হ্যান্ডআউট সকলকে দেওয়া হয় ও সভাতে সংগঠনের মুখপত্র অধিকার পত্রিকা বিক্রির একটি টেবিল দেওয়া হয়।

রিপোর্ট: বিএসএফ ও এনআইএ দ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার হরণের বিরুদ্ধে মিছিল, ডিএম ডেপুটেশন ও প্রেস বিবৃতি আহ্বানে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি।

গত দুই বছরে কুচবিহার, মালদা ও মুর্শিদাবাদ মিলিয়ে তথ্যানুসারে ১৬ জন বিএসএফের গুলিতে খুন হয়েছে বলে বিএসএফ অভিযুক্ত। এদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির মমিনুল ইসলাম, সাগরপাড়ার রুহুল মন্ডল ও জঙ্গিপুরের আনিকুল সেখ মিলিয়ে তিনজন বিএসএফের গুলিতে খুন হয়েছে বলে বিএসএফ অভিযুক্ত।

জেলার সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকায় জেলাশাসক দ্বারা বেআইনি লাগাতার বৈকাল ৬ টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি থাকার জন্য বৈকাল ৫ টার পর কোন ছাত্র এলাকার বাইরে পড়তে যেতে পারেনা বা পড়া শেষে ঘরে আসতে পারে না। এলাকার কেউ ঘর থেকে বের হতে পারেনা। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সমস্ত ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হয়। বাইরে কাজ করতে যাওয়া নির্মাণ শ্রমিকরা ট্রেনে করে এসে বিকাল ৫ টা বেজে গেলে আর বাড়ি ফিরতে পারেনা। সমস্ত বিএসএফ ক্যাম্প গুলিই গ্রামের মধ্যে। তা মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতেই হোক বা সাগর পাড়া বা জঙ্গিপুরের চর বাজিতপুর ও পিরোজপুর গ্রামে।

এই গ্রামদুটি শেষ হলে বাংলাদেশের সীমান্ত শুরু। সেখানে কোন বিএসএফ নেই। বিএসএফ আছে সীমান্ত থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার ভেতরে, গ্রামের মধ্যে। পদ্মা নদীর পাশে। সারাক্ষণ চলে তল্লাশির নামে হেনস্থা। কার্যত সীমান্তবর্তী সমস্ত এলাকাতেই বিএসএফ সেখানকার জনসাধারণের জীবন জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে। এরপর আবার কেন্দ্রীয় সরকারের ফরমান অনুযায়ী বিএসএফ'র টহলদারি ৫০ কিলোমিটার বাড়ানো হচ্ছে।

কোন এলাকাতেই কৃষকরা ইচ্ছে মতো ফসল ফলাতে পারেনা। ভুট্টা ও পাট চাষ করা প্রায় বন্ধ। নিজেদের জমিতে চাষ করতে যেতে গেলেও বিএসএফ ক্যাম্পে নাম লিখিয়ে যেতে হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী মাইলের পর মাইল এলাকার হাজার-হাজার জনসাধারণের দাবি

১. গ্রামগুলি ছেড়ে দিয়ে অবিলম্বে বর্ডারের নির্দিষ্ট এলাকায় বিএসএফ'কে ফিরে যেতে হবে।

২. বিএসএফ'র ৫০ কিলোমিটার টহলদারি এলাকা বৃদ্ধির ফরমান অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৩. জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার কৃষকদের পাট, ভুট্টা সহ কোন চাষেরই অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না।

৪. তল্লাশীর নামে সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ জনসাধারণকে প্রতিদিনের বেআইনী হেনস্থা বিএসএফ বন্ধ কর।

৫. জেলার সীমান্তবর্তী হাজার হাজার জনসাধারণকে চোরাচালানকারী তকমা দেওয়া অবিলম্বে বন্ধ কর।

৬. জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অবিলম্বে বেআইনী লাগাতার ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করতে হবে।

৭ গুলি চালানোয় অভিযুক্ত বিএসএফ ক্যাডারের বিরুদ্ধে লোকাল থানায় খুনের মামলা রুজু করতে হবে ও বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে হবে। বারংবার দাবি উঠছে

৮ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর আঘাত হানে এরকম কেন্দ্রীয় এজেন্সি NIA আমরা চাইনা। আমরা এনআইএ বাতিল চাই।

৯. NIA বাতিল কর। এনআইএ বাতিল সাপেক্ষে জেলাতে এনআইএ কোর্ট অবিলম্বে তৈরি করতে হবে।

১০. জেলার সীমান্তবাসী বিশেষত মুসলিমদের বাংলাদেশী

সন্ত্রাসবাদী তকমা দেওয়া বন্ধ কর।

১১. জেলার গরিব সাধারণ পরিবারকে এনআইএ দ্বারা কোনভাবেই দিল্লি বা হায়দ্রাবাদে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা যাবেনা। জেলাতে বা কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

১২. NIA'র বিনা ওয়ারেন্টে যখন তখন তল্লাশির নামে বাড়িঘর তছনছ ও গ্রেপ্তারির নামে তুলে নিয়ে যাওয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

উক্ত বক্তব্য ও দাবিগুলোকে সামনে রেখে গত ২৪ শে আগস্ট ২০২৩ জেলার সীমান্তবর্তী জনসাধারণের একটা অংশকে সাথে নিয়ে জেলার সদর শহর বহরমপুরে আজকের সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার হরণের প্রেক্ষিতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মিছিলটি করে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি। সম্ভবত সারা রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার হরণকারী বিএসএফ ও এনআইএ'র বিরুদ্ধে মিছিল। মিছিলটির চলন, যুবক ও বাচ্চা সহ মহিলাদের অংশগ্রহণ, স্লোগান ও সর্বোপরি সীমান্তবর্তী মানুষের আর্তি বহরমপুর শহরের সাধারণ পথ চলতি মানুষ ও ছোট ছোট দোকানদারদের রাস্তার দুই পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়। মিছিলটিকে নিয়ে আইবি, ডিআইবি ও পুলিশের সমাগমও ছিল দেখবার মতো।

মিছিল শেষে উক্ত দাবিগুলোর ভিত্তিতে জেলা শাসকের ঠিক করে দেওয়া প্রতিনিধিকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্যরা ছাড়াও বিএসএফ ও এনআইএ দ্বারা ভুক্তভোগী সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীরাও ছিল। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ছাড়াও বিভিন্ন পোর্টাল থেকে আগত সাংবাদিকদের এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতি দেওয়া হয়।

পানিহাটী শাখার ২০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৫ আগষ্ট,২০২৩ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি এ পি ডি আর-এর পানিহাটি শাখার ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা শাখার কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল। ৩৭ জন সদস্য প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে পর্য্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোমনাথ বসু। শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন শাখার সভপতি ধীরাজ সেনগুপ্ত, সম্পাদক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও অন্যরা। স্বাগত ভাষণ দেন ধীরাজ সেনগুপ্ত। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।এবং তুফান চক্রবর্ত্তী বার্ষিক হিসেব পেশ করেন।

প্রতিবেদনের উপর এবং বর্তমানে সংগঠনের বিবাদ-বিতর্ক, বিসংবাদ নিয়ে গঠন মূলক আলোচনা করেন ভূপেন সরকার। এ-ছাড়াও রবীন্দ্র নাথ ঘোষ, অশোক মজুমদার, ডাক্তার শৈবাল সিনহা, অলোক দাস, ফাল্গুনী ব্যানার্জী, গৌতম সাহা, শ্যামসুন্দর ঘাটা, কপিল দেও সিং, তুফান চক্রবর্ত্তী, কাঞ্চন সরকার, গঙ্গা ওরাও প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক বক্তাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে মানবাধিকার আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করার উপর জোর দেন।, সর্বসম্মতভাবে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং হিসেব গৃহীত হয়। এরপর পর্য্যবেক্ষক সোমনাথ বসু বক্তব্য রাখেন।

সভায় ভূপেন সরকার, তুফান চক্রবর্ত্তী এবং অলোক দাস আনীত তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।এরপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সভাপতি বার্ষিক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হুগলী জেলা কমিটি ও শাখাগুলির কার্যাবলীর প্রতিবেদন

২৩/০৭/২০২৩ চন্দননগরে ভূপেন সেন স্মারক বক্তৃতা— ২০২৩ (বক্তা : কুমার রাণা, বিষয়— শিক্ষা অধিকার ও দায়িত্ব) উপস্থিতি- ৭৫

২৬/০৭/২০২৩ মণিপুরে সরকারী মদতে কুকি জনজাতির উপর আক্রমণ ও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে চুঁচুড়া শাখার পথসভা।

২৮/০৭/২০২৩ মণিপুরে সরকারী মদতে কুকি জনজাতির উপর আক্রমণ ও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে শ্রীরামপুর শাখার দু'টি পথসভা।

২৯/০৭/২০২৩ ত্রিবেণী-বাঁশবেড়িয়া শাখার উদ্যোগে শাখার প্রাক্তন সদস্য শ্রীকৃষ্ণ পালের স্মরণ সভা।

৩০/০৭/২০২৩ চুঁচুড়ায় সনৎ রায়চৌধুরীর স্মরণ সভায় অংশগ্রহণ।

৩১/০৭/২০২৩ মণিপুরে সরকারী মদতে কুকি জনজাতির উপর আক্রমণ ও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের

প্রতিবাদে চন্দননগর শাখার পথসভা।

০৬/০৮/২০২৩ হুগলী জেলা কমিটির উদ্যোগে চুঁচুড়ায় আলোচনা সভা। বিষয়: রাষ্ট্রদ্রোহ আইন— অতীত ও বর্তমান, বক্তা- ঝুমা সেন, অনিতা অগ্নিহোত্রী ।(উপস্থিতি ৯০)

১২/০৮/২০২৩ হুগলী জেলা কমিটির উদ্যোগে সনৎ রায়চৌধুরীর স্মরণ সভা।(উপস্থিতি ৪৫)

০৩/ ০৯/২০২৩ শ্রীরামপু র শাখা আয়োজিত 'যতীন লাহিড়ী স্মারক বক্তৃতা। স্থান— মেনকা ভবন, রিষড়া। বিষয়— অভিন্ন দেওয়ানি বিধি-প্রস্তাব ও বাস্তবতা। বক্তা: শ্রীমতি আফ্রীজা খাতুন ও রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। উপস্থিত ৪৫ জন।

কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রমের রিপোর্ট

বিগত একান্ন বছর যাবৎ অধিকার আন্দোলনের যে ধারা এপিডিআর বহন করে চলেছে সময়ের চাহিদায় তার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ বন্দিমুক্তি ছাড়াও সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনার বিরুদ্ধেও এপিডিআর কে এগিয়ে আসতে হচ্ছে। ১৩ বছর বিনা বিচারে জেলে আটক রাজনৈতিক বন্দি কল্পনা মাইতি সহ পশ্চিমবাংলার জেলে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গত ৪ জুলাই ২০২৩ কলেজ স্ট্রিট এমজি রোড ক্রসিং মোহিনী মোহনের সামনে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা থেকে শুরত করে নির্বাচন পরবর্তী কালে বল্গাহীন সন্ত্রাস ও মৃত্যু মিছিলের প্রতিবাদে ২০ জুলাই ২০২৩ এক নাগরিক কনভেনশনের ডাক দেয় এপিডিআর।

কলেজ স্ট্রিটের মহাবোধি সোসাইটি হলের কনভেনশনে সমাজের বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির মতামত জানতে আমন্ত্রণ জানানো হয় চিত্র পরিচালক অপর্ণা সেন, শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার, সমাজকর্মী বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী সমীর আইচ, সমাজকর্মী নব দত্ত, ভাঙর জমি রক্ষা কমিটির মির্জা হাসান ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সংগঠক ডাঃ স্বপন জানা সহ আরও বেশ কিছু গণ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে। উপস্থিত বক্তারা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেন রাজ্যের প্রশাসনের নিস্ক্রিয়তা ও নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থা যা সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনে শাসকদলের স্বার্থেই ঘটেছে বলেই সভার অধিকাংশ বক্তা মনে করেন। ভাঙড়ে নির্বাচনের শুরু থেকে যেভাবে পুলিশ সন্ত্রাস নামিয়ে আনে তা' মির্জা হাসানের বক্তব্যে উঠে আসে। সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে বারবার অনুরোধ জানানো সত্বেও সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচন করতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা না করে নির্বাচন কমিশন শাসকদলের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করেছেন বলেই তাদের স্পষ্ট অভিযোগ। এই সভায় একটি চিঠির বক্তব্য পাঠ করে শোনান চিত্র পরিচালক অপর্ণা সেন যা সমাজের বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষের স্বাক্ষর সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি হিসেবে পাঠানোর জন্য লেখা। বহু সমাজ মাধ্যমের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এই সভায়। তারা অপর্ণা সেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনের সঙ্গে কথা বলেন। অপর্ণা সেনের বক্তব্য সারা রাজ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করে ও তার সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ রাজ্যে এই বিষয়ে বহু চর্চা শুরু হয়।

এপিডিআর সংগঠনের প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই অধিকার আন্দোলনের ও বন্দিমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হুগলী জেলার সহ সভাপতি ও সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা সনৎ রায়চৌধুরীর জীবনাবসান হয় গত ১ জুলাই ২০২৩-এ। তাঁর কর্মময় জীবন স্মরণ করতে মহাবোধি সোসাইটি হলে ৩ অগাস্ট ২০২৩ এপিডিআর 'স্মরণ সভা'র আয়োজন করে তাঁর গুনমুগ্ধরা ও তাঁর সহকর্মীরা গণ আন্দোলনে তাঁর গৌরবাজ্জ্বল ভূমিকা, মহান মানুষ ও একজন শিক্ষক হিসাবে তাঁর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

গত ২৪ অগাস্ট ২০২৩, পূর্ব কলকাতা শাখা অফিসে এপিডিআর এর উৎসাহী বহু কর্মী মিলিত হয় একটি আলোচনা সভায়। যেখানে কয়েকজন ডাক্তার, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সুজয় প্রসাদ ভট্টাচার্য, ডাঃ গৌতম দাস, কৃষি গবেষক ডঃ অনুপম পাল ও রোগীর অধিকার রক্ষা কর্মী উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। আগামী দিনে ভয়ংকর যে সব পরিকল্পনা দুনিয়ার শাসকরা একযোগে নিতে চলেছে এবং তার ফলে স্বাস্থ্য ইমারজেন্সি ঘোষণা করে মানুষের সমস্ত অধিকার হরণের যে ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত করান। সম্ভব হলে একসঙ্গে কিছু কর্মসূচী নেওয়া যায় কিনা সেটা খতিয়ে দেখার তাঁরা অনুরোধ করেন। আগামী সম্পাদকমন্ডলীর সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের জানানো হবে এই কথা বলা হয়।

সার্বভৌম বনাম ভারত রাষ্ট্র

বিশেষ প্রতিবেদন

সাতাত্তরটা স্বাধীনতা দিবস পার হয়ে এলাম। বছর দুয়েক আগে সাড়ম্বরে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করেছি। 'হর ঘর পে তিরঙ্গা' উড়িয়েছি। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে গালভরা বক্তৃতা দিয়েছি। বলা ভাল শুনেছি। কিন্তু স্বাধীনতা কোথায়! ঐ পতাকা তলে? না শাসকের পদতলে? গত দশ বছরে ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনা-তো বলে, প্রমাণ করে, স্বাধীনতা শাসকের ইচ্ছাধীন। অনেক লড়াই, সংগ্রাম, দমন-পীড়ন, বিভেদ, দ্বিচারিতা পেরিয়ে সাতাত্তর বছর আগে একটা দেশ স্বাধীনভাবে তার যাত্রা শুরু করল। যুক্তরাষ্ট্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেল। দেশ চালানোর মানদন্ড সংবিধান এল। সার্বভৌম হিসেবে ঘোষিত হল। আজ সেসব কোথায়! সবই আজ ভূলুণ্ঠিত। আজ আবার নতুন করে রাজার অধীন, প্রজা হওয়ার দিন! বর্তমান শাসক গত দশ বছরে কৌশলে দেশটাকে সেদিকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। রাজ্যে-রাজ্যে সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসীদের উপর নিপীড়ন, অত্যাচার, অধিকার কেড়ে নেওয়া, বেআইনি দখল বা ভুয়ো সংঘর্ষের গুজব ছড়িয়ে বুলডোজার দিয়ে বাড়ি-ঘর, দোকানপাট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে, দেশটা সবার জন্য নয়! মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষমতাশালী মানুষের জন্য। যারা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিভূ বলে মনে করে।

দিল্লী, আসাম, রাজস্থান পেরিয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া হরিয়ানার ঘটনা প্রমাণ করে মুসলমানরা এদেশের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। গুজরাট গণহত্যার মতো, পরিকল্পনা করে হরিয়ানার দরিদ্রতম সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ধর্মীয় মিছিল করার পরিকল্পনা করে; বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। আগে থেকে ঘোষণা করে জানিয়ে দেওয়া হয়, ঐ মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন বজরং দল কর্মী মনু পানেসর। মনু পানেসর কে? না, গত ফেব্রুয়ারিতে ভিওয়ানিতে দুই মুসলিম যুবককে খুন করার ঘটনায় যে অভিযুক্ত এবং পলাতক! এরপর, পরিকল্পনা মাফিক ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের হয়। পরিকল্পনা করেই ঢিল,পাথর ছোঁড়া হয় এবং পরিকল্পনা মাফিক মুসলিম মহল্লা আক্রমণ করা হয়। মাদ্রাসা মসজিদে ঢুকে মারধর করা হয়। হত্যা করা হয় ২২ বছর বয়সী ইমাম সহ আরও পাঁচজনকে। মসজিদে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। পরেরদিন সংঘর্ষ আশেপাশের এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল কলেজ সরকারি দপ্তর বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এসবের মাঝেই চলে, হুমকি এবং শাসানি। বিপাকে পড়ে কাজের খোঁজে যাওয়া বাংলার মুসলিম পরিবার গুলি। টাকার অভাবে তারা না-পারে ফিরতে, না-পারে থাকতে। আতঙ্কে ভুগতে থাকে। বাইক বাহিনী হুমকি দিয়ে যায় মুসলমানদের বাড়ি ভাড়া যেন না-দেওয়া হয়। মুসলমানদের বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়। হুমকি ভাষণ চলে পুলিশের সামনেই। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বলেন 'সরকার সকলকে সুরক্ষা দিতে পারে না। এমনকি পুলিশ-সেনা মিলেও সুরক্ষার ফুল-প্রুফ গ্যারান্টি দিতে পারে না।' একে আমরা কী বলবো? সরকারের ব্যর্থতা? উদাসীনতা? না কোনও-টাই নয়। এটা পরিকল্পনা। ঠান্ডা মাথার চক্রান্ত। রাষ্ট্রীয় মদতে জাতিদাঙ্গা। মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রাখা।

নুহ হল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা এবং দেশের সবচেয়ে দরিদ্রতম জেলা। এখানে কোনও শাসকদল কোনও রকম উন্নয়ন করেনি। গত পাঁচ বছরে এখানে কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। দেশভাগের সময় এই এলাকার মুসলিম জনসাধারণ পাকিস্তান চলে যেতে চাইলে স্থানীয় শিখ সম্প্রদায় এঁদের আশ্বস্ত করে। রক্ষার দায়িত্ব নেয়। সাম্প্রতিক ঘটনাতেও তাঁরাই মসিহা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বুক দিয়ে আগলেছেন। না-হলে লাশের তালিকায় আরও কিছু সংখ্যা যোগ হত।

কেন হচ্ছে এসব? একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজও কেন জাতপাত ভেদাভেদ। যেখানে অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে চন্দ্রাভিযান হচ্ছে। সেখানে এত জাতিবিদ্বেষ কেন! না, ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হবে। অখন্ড ভারত হবে। একদেশ একজাতি, একভাষা, একধর্ম হবে। এই মেকি একমেবাদ্বিতীয়ম-এর ছল-চাতুরীতে এক মানুষকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর-এক মানুষের বিরুদ্ধে। এটা সস্তা এবং হিংস্র জনপ্রিয়তা। অথচ ভারতের রাষ্ট্রের হাতে ছিল অন্য উপায়ে একমেবাদ্বিতীয়ম হওয়ার উপায়। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দেশের মেধা এবং সম্পদকে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল, উন্নয়নকামী দেশগুলোর সাথে টক্কর দেওয়ার কাজে লাগানো যেত। জাপান যা'-পারল, চীন যা'-পারল, কোরিয়া যা-পারল। আমরা তা' পারলাম না। কেন? সঙ্কীর্ণ জাতিবিদ্বেষ। ব্রিটিশের ফেলে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে divide and rule policy। একটা দেশ, সকল দেশের সেরা হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। 'ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম' কেবল খাতার পাতায়, গানের কলি কিংবা মেকি দেশপ্রেম হয়ে রয়ে গেল। সূর্যের অন্ধকার দিকে রয়ে গেল সংখ্যালঘু,

দলিত, আদিবাসীরা। তাই গুজরাট হয়, দিল্লী হয়, মণিপুর হয়, হয় হরিয়ানা। আর উত্তরপ্রদেশ তো আঁধারের রাজ্য হিসেবে নাম লিখিয়ে ফেলেছে। সেখানকার অপরাধের পরিসংখ্যান দিতে গেলে খাতার পাতা ভরে যাবে। যে রাজ্যের শিক্ষিকা জন্মসূত্রে মুসলমান হওয়ার অপরাধে এক শিশু শিক্ষার্থীকে অন্যান্য শিশু শিক্ষার্থীদের দিয়ে মারায়। আর অত্যাচারিত শিক্ষার্থীর পিতা কোনও রকম অভিযোগ করতে ভয় পায়। সে তো জঙ্গলের রাজত্ব! উর্দু কবি জেহরা নিগাহ লিখেছিলেন - ''শুনা থা জঙ্গলো কো ভি কোঈ দস্তুর হ্যায়'' । উত্তরপ্রদেশে কোন দস্তুর চলে না। এখানে যোগী হ্যায়-তো মুমকিন হ্যায়।

এ অবস্থা হয়তো আমরাও দেখতে চলেছি। এ রাজ্যের এক বিজেপি নেতা ধর্ষণ বন্ধে এনকাউন্টার দাবি করেছেন। আমরাও চাই ধর্ষকদের কঠোর শাস্তি হোক। এনকাউন্টার-তো নয়, ভুয়ো এনকাউন্টারের নামে কার প্রাণ যাবে! বুঝে নিতে খুব অসুবিধা হয়-কি? যেখানে এক প্রাক্তন বিজেপি নেতা, অধুনা তৃণমূল সমর্থক হুমকি দিয়েছিলেন মুসলমানদের পাকিস্তানে পাঠানোর। সেখানে এনকাউন্টার কাদের জন্য? বুলডোজার কাদের জন্য?

নজরকাড়া সংবাদ

ভাবো ভাবো, ভাবা অভ্যাস করো

মানিক ঘোষ

গত ২৪-০৮-২৩ সমাজ মাধ্যমে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়, দেখা যায়, একটি বাচ্চাদের স্কুলের একজন শিক্ষিকা ছাত্রদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তাদেরই এক সহপাঠী একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে , তাকে গিয়ে একে একে চড় মেরে আসতে। স্কুলটি উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগরে অবস্থিত 'নেহা পাবলিক স্কুল' নামের একটি প্রাইভেট স্কুল। শিক্ষিকার নাম ত্রিপ্তা ত্যাগী। ভিডিওটি করে ঐ শিশুটির এক তুতো ভাই। তা'তে শিক্ষিকাকে বলতে শোনা যায়, ''যত সংখ্যালঘু বাচ্চা আছে তাদের সবাইকে আমি ...''। অতঃপর রাজ্যটির বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে নিন্দা বার্তা আমরা সমাজ মাধ্যমে দেখেছি।

শিশুটির বয়স ৭ বছর। প্রথমে ওর বাবা-মা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে চাননি, পরে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জমা পড়ে এবং FIR হয়। আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বক্তব্য মুজফ্‌ফরনগরের জেলা শাসক অরবিন্দ মাল্লাপ্পা বাঙ্গারির। যদিও শিক্ষিকা ত্রিপ্তা এই ঘটনার অস্বীকার করেছেন। ভুল হয়েছে স্বীকার করে নিয়েও তার বক্তব্য, তিনি প্রতিবন্ধী হওয়ার জন্যই তাঁকে ছাত্রদের দিয়ে শাসন করতে হয়েছে; এখানে হিন্দু মুসলমান কোনো ব্যাপার নেই। এমন-কী যে-শব্দগুলি ওনার মুখে শোনা গেছে তা' বিকৃত করে বসানো হয়েছে বলেও দাবি করেছেন।

আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়ত এই ঘটনাটি নতুন কোনও খবরের মাঝে হারিয়ে যাবে। আমরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছি এক পৃষ্ঠা উল্টে নুতন কোনও পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করতে। কিন্তু শিশু মনে যে বিদ্বেষ-বীজ রোপন করা হল তার বড় হওয়ার সাথে সাথে সেই বীজ যে বিষবৃক্ষের আকার ধারণ করবে তার কী হবে ?

আমরা বিজ্ঞান নিয়ে এত পড়াশোনার পরেও অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাটতে আমাদের গা-ছমছম করে। কেন? অভিভাবকেরা আমাদের সহজে বাগে আনার জন্য ছোট্ট বেলায় অন্ধকার আর ভূতপ্রেতের বিভিন্ন গল্পের আশ্রয় নিতেন, তা' আমাদের অবচেতন মনে এমন ভাবে প্রথিত হয়ে থেকে যায় যে, বড় হয়েও তা যুক্তির কাছে হার মানে, আমাদের গা ছমছম করে।

ছোট্ট বেলা থেকেই আমাদের মা , মাসি , পিসি, কাকি মায় সমস্ত স্তরের অভিভাবকবৃন্দ কথাচ্ছলে বলেন, ওরা নোংরা, বস্তিতে থাকে, গরু খায়, ছাগল মুর্গিকে দগ্ধে দগ্ধে মারে, ওরা নৃশংস। যতো চোর ডাকাত, সব ওরাই ইত্যাদি সব বাক্যবন্ধ প্রসঙ্গক্রমে আমাদের কানের কাছে বাজাতে থাকে। শিশুমন কখন যেন সেই সব কথাকে মনের গভীরে প্রোথিত করে ফেলে এবং বড় হওয়ার সাথে-সাথে তা' আমাদের অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয়। সব কিছু বুঝেও আমরা সেই ট্রমা থেকে বেরোতে পারি না। অজান্তেই সেই বিদ্বেষ আমাদের গ্রাস করে। এখন শুধু দরকার একটা গুজব বা একটা উস্কানি; তার প্রতিক্রিয়ায়, বাধ ভাঙ্গা জলের মতো তা' আছড়ে পড়ে ওদের ওপর। না, সেখানে নেই কোনও যুক্তি; নেই কোনও তর্কের অবকাশ; শুধু ধ্বংসের আনন্দ। প্রতিক্রিয়াশীল দের হাতের পুতুলে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। সেই কারণেই, কোনও স্থানে দাঙ্গা ঘটে যাওয়ার পরদিন ঐ অঞ্চলে গেলে একটা কথা প্রায়শই শোনা যায়, আগের দিন রাতেই একসঙ্গে বসে চা খেয়েছে সবাই, গল্প করেছে তারপর কী-যে হয়ে গেল! এই কারণেই ঐ শিক্ষিকা একে ছোট একটা ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। এ-রকম করে ভাবাটাই তাঁর কাছে স্বাভাবিক।

শিশুবেলা থেকে লালিত অন্ধবিশ্বাসের ফল এই ভাবনা। তা'হলে আমরা কী করব, কী ভাববো, কী ভাবে ভাববো ?

ছোট্ট বেলার গতানুগতিক পাঠের সঙ্গে এর কোনও পাঠ দেওয়া সম্ভব কি ? কারণ, এটা মনে রাখতে হবে দাঙ্গা করানোর জন্য যাদের ব্যবহার করা হয় তারা বেশিরভাগই কিশোর বয়সের। আর ঐ, 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম'-এ শুধু দীর্ঘদিনের লালিত বিষবৃক্ষের ডালপালা ছাটা ছাড়া আর কিছু করতে সক্ষম নয়। ঐ বৃক্ষ স্ব-মূলে উপড়ে ফেলতে তা' কখনোই সক্ষম নয়। রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক পরের বিষয়; তার আগেই যে সব শেষ ।

গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষা সংগঠন, ওড়িষা
প্রেস রিলিজ

ভাষান্তর: পৃথ্বীরাজ মোদক

তারিখ ২৭ আগস্ট, ২০২৩— ওড়িষার তিন জেলায় গত তিন সপ্তাহে ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং দুজনকে আটক করা হয়েছে।

— বেদান্ত কোং, আদানি কোং এবং হিন্ডালকোর বক্সাইট খনির জন্য এই ধরনের গ্রেপ্তার।

— স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় উসকানিমূলক ঘটনা ঘটানো হচ্ছে যাতে প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের গ্রেপ্তার করা যায়।

— যদিও এই এলাকার আদিবাসীরা উন্নয়ন চায় না, তথাকথিত 'বিকাশ' তাদের দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে— তাদের জমি, বন, পাহাড়, সর্বোপরি তাদের জীবিকা ধ্বংস করতে।

আমরা, 'গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষা সংগঠন, ওড়িশা'-এর পক্ষ থেকে গত তিন সপ্তাহ ধরে দক্ষিণ ওড়িশার বিভিন্ন প্রস্তাবিত খনির এলাকায় চলমান রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের তীব্র নিন্দা জানাই। ২৩ আগস্ট, ২০২৩-এ, মালি পর্বত সুরক্ষা সমিতির দুই পদাধিকারী, কোরাপুট, অভি সোদি এবং দাস খারাকে সাধারণ পোশাক পরা মোটরবাইক চালকরা তুলে নিয়ে যায়। আমরা ৫ আগস্ট কালাহান্ডি জেলার নিয়মগিরি এলাকায় এবং ১৬ আগস্ট রায়গাদা জেলার সিজিমালি এবং কুক্রুমালি এলাকায় দেখেছি এমন দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পুলিশ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। যদিও অভি সোদি এবং দাস উভয়ের পরিবারের সদস্যরা খারা পতঙ্গী থানায় পৃথক এফআইআর দায়ের করেছে, তারা কোথায় তা এখনও অজানা। আমরা যখন এই বিবৃতিটি জারি করতে যাচ্ছি তখন আমরা জানতে পারি যে অভি সোদি এবং দাস খারা ২৭শে আগস্ট তাদের নিজ নিজ গ্রামে ফিরে গেছে।

নিয়মগিরি এলাকায়, লাখপাদার গ্রামের কৃষ্ণ সিকাক্কা এবং বারি সিকাক্কা, দুই আদিবাসী কর্মী, লাঞ্জিগাদা সাপ্তাহিক বাজার থেকে ফেরার সময় ৫ ই আগস্ট সাদা পোশাকের ওড়িশা পুলিশ কর্মীদের দ্বারা জোরপূর্বক অপহরণ করা হয়েছিল। নিয়মগিরি সুরক্ষা সমিতির কর্মীরা তাদের সহকর্মীর অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের পর, পুলিশ তাদের জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে। এভাবে গত ৬ আগস্ট স্থানীয় আদিবাসীরা কল্যাণসিংহপুর থানার সামনে বিক্ষোভ করে তাদের মুক্তির দাবি জানান। তারা ফেরার সময় স্থানীয় পুলিশ লাখপাদার গ্রামের ড্রেঞ্জু ক্রিসিক্কা নামে আরেক আদিবাসী কর্মীকে জোরপূর্বক গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। গ্রামবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করে এবং তাদের প্রচেষ্টায় গ্রেফতার রোধ হয়। কিন্তু, স্থানীয় পুলিশ আদিবাসীদের প্রতিবাদকে ক্ষ্মবেআইনি কার্যকলাপক্ষ্ম বলে উল্লেখ করে একটি এফআইআর দায়ের করেছে।

নিয়মগিরি সুরক্ষা সমিতির সাথে যুক্ত আটজন আদিবাসী কর্মীর বিরুদ্ধে ইউএপিএ এবং আইপিসির বিভিন্ন ধারার মতো অগণতান্ত্রিক আইন। কালাহান্ডি জেলার আম্বাদোলা গ্রামের বাসিন্দা, উপেন্দ্র বাগ, যার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, তাকে রায়গাদা পুলিশ তুলে নিয়েছিল, তার ছেলে হেবিয়াস কর্পাস ফাইল করতে না যাওয়া পর্যন্ত তার গ্রেপ্তারের বিষয়টি স্বীকার করা হয়নি। এরপর তাকে আদালতে হাজির করে তিন দিন আটক রাখার পর কারাগারে পাঠানো হয়। তার পরিবারের সদস্যরা জানায়, তাকে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে। অবৈধ আটকের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্রতিবাদ কীভাবে ক্ষ্মসন্ত্রাসবাদীদেরক্ষ্ম কার্যকলাপ হতে পারে যার জন্য রাজ্য সরকার ইউএপিএ ব্যবহার করেছে? জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারের অনুশীলন বন্ধ করার এবং নিজের অন্যায়গুলিকে সাদা করার জন্য সরকারের হুমকি, ইউএপিএর এই ধরনের ব্যবহার নিছক কর্তৃত্ববাদের প্রদর্শন। পুলিশ, যারা কৃষ্ণাকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করছিল, পরে ২০১৮ সালে দায়ের করা একটি মিথ্যা মামলার অধীনে এগিয়ে দিয়ে বারীকে ছেড়ে দেয় এবং তার গ্রামে পাঠিয়ে দেয়।

যদিও রাজ্য সরকার রায়গড়া জেলার কাশিপুর এলাকায় অবস্থিত সিজিমালি থেকে বক্সাইট খনির কাজ বেদান্ত কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে গণশুনানি এবং গ্রামসভার অনুমোদন বেদান্ত কোম্পানির

কাছে, গণশুনানি এবং গ্রামসভার অনুমোদন প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। এমতাবস্থায়, মৈত্রী ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড মাইনিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর কিছু পদাধিকারী, দাবি করে যে তারা সিজিমালিতে খনির কাজ করার জন্য বেদান্ত কোম্পানির দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে, ১২ই আগস্ট স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় সেই খনির এলাকায় যায়।—পরিদর্শন মৈত্রী প্রাইভেট লিমিটেডের এই পদক্ষেপ স্থানীয় লোকজনকে বিরক্ত করেছিল এবং তারা এই ধরনের সাইট-ভিজিটের প্রতিবাদ করেছিল। এর ফলে ধনফুলা মাঝি, সিন্দুরঘাটি পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সরপঞ্চ, যিনি 'সিমালি কুক্রুমালি সুরক্ষা সমিতি'-এর পদাধিকারী হিসাবেও পরিচিত, এবং সীতারাম মাঝি এবং অনিল মাঝি, দুজনেই প্রাক্তন সমিতির সদস্যকে ১৬ আগস্ট রায়গড়া পুলিশ কর্তৃক জোরপূর্বক অপহরণ হয়। এই মাসের ১৯ তারিখে জনগণের বিক্ষোভ বেড়ে যাওয়ায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। ইতিমধ্যে, ২১ জন গ্রামবাসীকে ইতিমধ্যেই আইপিসি, ফৌজদারি সংশোধনী আইন এবং অস্ত্র আইনের বিভিন্ন ধারায় সিমালি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হারাম এড়িয়ে চলার সময়! এরকম বেআইনি গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ও এখন তাকে এমকে.সিই মেডিকেল কলেজ, বেরহামপুরে চিকিৎসা করা হচ্ছে। নিজের ভূমি বন ও প্রকৃতি রক্ষার কাজটি সিআরপিসি বা আইপিসি-এর অধীনে কোনো অপরাধমূলক কাজ নয় যে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে। বেশ দীর্ঘ সময় ধরে, প্রথমে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় উস্কানিমূলক ঘটনাগুলিকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে এবং তারপরে গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়ে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরে, হত্যার চেষ্টার মতো আইপিসির অজামিনযোগ্য ধারায় এলোমেলো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

কল্যাণসিংহপুর থানার পাশাপাশি নিয়মগার্ল এলাকায় এবং কাশিপুরের সিমন এলাকায়, কোরাপুট জেলার পাতঙ্গি ব্লকের মালিপারভাত এলাকায় এখন একই ধরনের ঘটনা ঘটছে। ২৩ শে আগস্ট, ২০২৩-এ, কিছু অসামরিক ব্যক্তি নিজেদেরকে পুলিশ হিসাবে জাহির করে দুটি ভিন্ন জায়গা থেকে 'মালি পর্বত সুরক্ষা সমিতি' এর দুই পদাধিকারী শ্রী অভি সোদি এবং শ্রী দাস খারাকে তুলে নিয়েছিল। প্রায় ৪২টি গ্রাম এখন প্রস্তাবিত HINDALCO বক্সাইট-খনন প্রকল্পের বিরোধিতা করছে। ওড়িশা হাইকোর্ট রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, ওড়িশা দ্বারা অনুষ্ঠিত গণশুনানি (অক্টোবর ২০২২) বাতিল করেছে এবং এটি আবার সংগঠিত করার নির্দেশ দিয়েছে। পরবর্তী শুনানিতে (জানুয়ারি২০২৩) জনগণ তাদের বিরোধিতা প্রকাশ করে। নিয়মগিরিতে গ্রামসভার সিদ্ধান্তের পরে বেদান্ত কোম্পানির চুক্তি বাতিল হওয়া সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত, রাজ্য সরকার স্থানীয় ডোংরিয়া আদিবাসীদের আশ্বস্ত করেনি যে নিয়মগিরি পাহাড়গুলি কোনও কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করা হবে না। সিজমালির ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকার কোনও আইনি অনুমতি ছাড়া এলাকায় প্রবেশ করা মৈত্রী কোম্পানিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে না। এমনকি মালিপর্বত মামলায়, হাইকোর্টের রায় সত্ত্বেও, রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনের কর্পোরেট-পন্থী সম্পৃক্ততার পর্যালোচনা করেনি। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন করতে চায়।

সেসব এলাকার আদিবাসীরা উন্নয়ন না চাইলেও তথাকথিত 'বিকাশ' তাদের দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। কারণ, সরকারের লক্ষ্য তাদের জমি, বন, পাহাড় সর্বোপরি তাদের জীবিকা ধ্বংস করা। ওড়িশা সরকারের এই সাম্প্রতিক ক্ল্যাম্পডাউনটি এখানে উল্লেখ করা অযৌক্তিক নয়। খনি বিরোধী প্রতিরোধ কর্মীদের উপর দেখতে হবে বন সংরক্ষণ বিলের সাম্প্রতিক সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে যা কোনো ছাড়া বা কারণ ছাড়াই 'ডিমড ফরেস্ট'-এর অস্তিত্ব বন্ধ করে দিয়েছে। নিয়ামগার্লে, রিপোর্ট অনুযায়ী, ৯০ শতাংশের বেশি বন এই বিভাগের অধীনে পড়ে। আমরা এই সত্যটি সম্পর্কে সচেতন যে এটি খনির কর্পোরেট হাউস এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বাণিজ্য-অফ সক্ষম করার উদ্দেশ্যে, আমরা, GASS-এর পক্ষ থেকে, সরকারের এই জনবিরোধী নীতির, পুলিশের বর্বরতা, যে প্রক্রিয়ায় UAPA এবং অস্ত্র আইনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকারকে আক্রমণ করার লক্ষ্যে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা জানাই। এছাড়াও আমরা সকল রাজনৈতিক দল, প্রগতিশীল সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, লেখক এবং মিডিয়া ব্যক্তিদের কাছে আবেদন জানাই, এই গ্রহটিকে আরও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সরকারের দমনমূলক, অগণতান্ত্রিক ও ধ্বংসাত্মক নীতির বিরোধিতা করার জন্য, যাতে আমাদের পৃথিবী দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে, গোলক বিহারী নাথ, সভাপতি; দেব রঞ্জন, সাধারণ সম্পাদক।

যোগাযোগ—gassbhubaneswara@gmail.com

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের মৃত্যু— কিছু কথা

বিশেষ প্রতিবেদন

গত ৯ই আগস্ট, ২০২৩, যাদবপুর বিশ্বাবিদ্যালয়ের মেইন হোস্টেলে বাংলা বিভাগের স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের একটি ছাত্রের দেহ হোস্টেলের বারান্দার নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায়। কে পি সি হাসপাতালে ভর্তি হলেও তাকে বাঁচানো যায়নি। অভিযোগ ওঠে হোস্টেলে র‍্যাগিং এর ফলেই ছাত্রটির মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন দল, সংগঠন দোষীদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। যাদবপুর থানায় হত্যার অভিযোগে এফ আই আর হয়। লালবাজারের কমিশনারের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। হোস্টেলের বহু ছাত্রকে দফায় দফায় জেরা করে কয়েকজন প্রাক্তনী সহ মোট বারোজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান বিভাগের ডিনের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয়টির অনুসন্ধানের জন্য। এ পি ডি আর-এর একটি তথ্যানুসন্ধানী দল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে গিয়ে বিভিন্ন পক্ষের সাথে কথা বলে। মিডিয়াতে বিভিন্ন সময়ে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির বহু পর্যবেক্ষণ ও মতামত জানতে পারা যায়। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থাকে পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী এটা নিশ্চিত হোস্টেলে ছাত্রটির উপর র‍্যাগিং হয়েছিল।

যাদবপুরে প্রথম বর্ষের ছাত্রদের জন্য আলাদা কোনও হোষ্টেল ছিল না। সিনিয়র জুনিয়র সব ছাত্র একই হোষ্টেলে থাকতো। এই নিয়ে UGC'র নির্দেশিকা ও সুপ্রিম কোর্টের রায় না-মানার অভিযোগ উঠেছে। হোস্টেলে নথিভুক্ত নয় এমন অনেকেই থাকতো বলে জানা যাচ্ছে। কিছু প্রাক্তন ছাত্র বহুদিন ধরেই হোস্টেলের ঘর দখল করে আছে বলে অভিযোগ উঠছে। বর্তমান ছাত্রদের অনেকে হোষ্টেল না পেলে নথিভুক্ত আবাসিকদের অতিথি হিসাবে হোষ্টেলে থাকতো, আর্থিক কারণে। এই ঘটনায় মৃত ছাত্রটিও হোষ্টেল পায়নি। হোস্টেলের কারও সহায়তায় সে হোষ্টেলে থাকতে শুরু করে।

ছাত্রটির বাড়ি নদিয়ার বগুলায়। স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভরসা করে হোস্টেলে গিয়েছিলো। তার পরিবার ভরসা করেই ছেলেকে রেখে গিয়েছিলো হোস্টেলে। সমস্যা থাকলেও যাদবপুর কাউকে ফিরিয়ে দেয় না এই প্রত্যয় নিয়ে। সমস্ত স্বপ্ন ও প্রত্যয় ধ্বংস হয়ে গেলো কিছু আবাসিকের র‍্যাগিং এর মতো জঘন্য আধিপত্যবাদী মানসিকতার জন্য। প্রথম বর্ষের জড়োসড়ো, শঙ্কিত, নতুন অতিথিকে আগলে রাখার প্রত্যাশাকে পায়ে দলে তার উপর মানসিক ও শারীরিক দমন পীড়ন নামিয়ে ফাঁকা বীরত্ব প্রদর্শনের এক ভয়ানক পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে হলো। এমনকি ছাত্রটিকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর তাকে বাঁচানোর উদ্যোগের পরিবর্তে ঘটনাটি নিয়ে হোস্টেলের সংঘবদ্ধ বয়ান তৈরী করার জন্য আবাসিকদের নিয়ে সভা করার উদ্যোগ প্রধান হয়ে গিয়েছিলো বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই মানসিকতা অমানবিক। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর বহু তথ্য সামনে আসছে। হোস্টেলে প্রাক্তনীদের রাজ চলতো। হোষ্টেলের দায়িত্বে কোনও শিক্ষক নেই। চুক্তিতে নিযুক্ত সুপারদের দায়িত্বে হোস্টেল। ছাত্ররা তাদের মানে না। সুপাররা কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। এই ঘটনার কিছু সময় আগে ছাত্রটির অস্থিরাবস্থার কথা জানিয়ে ডিন অফ স্টুডেন্টস এর কাছে ফোন গিয়েছিলো। তিনি সুপারকে জানান। কিন্তু সুপার হোস্টেলের ভিতরে গিয়ে সময়মতো হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি। তিনি জানিয়েছেন, ছাত্রদের বাধায় তিনি উপরে উঠতে পারতেন না।

র‍্যাগিং আটকানো বা র‍্যাগিং এর বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ মোটেই যথাযথ ছিল না বলে অভিযোগ উঠেছে। UGC প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে বহু প্রশ্ন তুলেছেন যার সদুত্তর বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারে নি। বহু বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সতর্ক হওয়া উচিত ছিলো। আরও উদ্যোগের প্রয়োজন ছিলো। র‍্যাগিং এর সাথে যুক্ত ছাত্ররা-তো অপরাধ করেছেই ,কিন্তু এই মর্মান্তিক মৃত্যুর দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পক্ষের।

র‍্যাগিং একটা জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যা। পৃথিবী এবং ভারতবর্ষের সমস্ত হোষ্টেলে, প্রতিষ্ঠানে এমনকি কর্মক্ষেত্রেও র‍্যাগিং চলে আসছে। বহু পদক্ষেপ নেওয়ায় তীব্রতা কমলেও র‍্যাগিং বন্ধ করা যায় নি। যাদবপুরের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে যখন হৈ-চৈ চলছে তখনি জানা যাচ্ছে, খড়্গপুর আই.আই.টি হায়দ্রাবাদ,মোজাফ্ফরপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় র‍্যাগিং এর কারণে ছাত্র-ছাত্রীর মৃত্যুর কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার ক্যাম্পাসের র‍্যাগিং এর অভিযোগ পুলিশকে জানালেও পুলিশ পদক্ষেপ নেয় নি। খড়্গপুরে কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ হত্যার ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালাবার চেষ্টা করেছে। আদালতের হস্তক্ষেপে নতুন করে মামলা শুরু হয়েছে। যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর পর অন্তত বিশ্ববিবিদ্যালয়ের ভিতর

থেকেই ডিসিদের শাস্তির দাবি উঠেছে। দেরিতে হলেও কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নিয়েছে।

র‍্যাগিং বন্ধ করার ব্যাপারে UGC, প্রতিষ্ঠান, সরকার, পুলিশ কেউই যথাযথ গুরুত্ব দেয় না। কেবলমাত্র বড়োসড়ো ঘটনা ঘটলে একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের র‍্যাগিং বিরোধী দায় পালন করে। রাজ্য সরকার এই ঘটনার পর আন্টি র‍্যাগিং কমিটি তৈরী করেছে। আসলে র‍্যাগিং এর পিছনে যে মানসিকতা কাজ করে তা' হলো বিপক্ষে কেউ প্রতিরোধ দেওয়ার জায়গায় না থাকলে অন্যায়ভাবে তার উপর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবো। তাকে শারীরিক মানসিক ভাবে লাঞ্ছিত করবো, অপমান সইতে বাধ্য করবো। শাস্তির কোনও ভয় নেই তাই দাদাগিরি করবো। এই মানসিকতা সমাজে ক্রমশঃ বাড়ছে। সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুকে আক্রমণ করছে। উঁচু জাত নিচু জাতের মানুষদের অস্পৃশ্য করে রাখছে। শাসক দল বিরোধীদের কোণঠাসা করে রাখছে। রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ যুগলবন্দিতে সাধারণ মানুষ প্রথম বর্ষের ছাত্রদের মতোই অসহায়। আধিপত্যবাদ বিভিন্ন রূপে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। র‍্যাগিং আধিপত্যবাদের প্রাথমিক রূপ, যেখানে বিশেষ স্বার্থ ছাড়াই শুধুমাত্র আধিপত্য দেখানোর সস্তা সুযোগ নেয় কিছুদিনের সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীরা। বিতর্ক যাই থাকুক, সুস্থ সমাজের স্বার্থে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থে, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্বার্থে র‍্যাগিং-কে সর্বাত্মক বিরোধিতা করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত র‍্যাগিং কার্যকর বা ততটা আপত্তিকর নয় — এই ধরনের শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে। শুধুমাত্র নজরদারি বাড়িয়ে এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না, যায় নি। বেশি গুরুত্ব দিতে হবে মানসিকতা পরিবর্তনের। সচেতনতা বৃদ্ধি ও কাউন্সেলিং এর সাথে-সাথে সবরকমের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের, মধ্য দিয়ে।

র‍্যাগিং এর সমস্যা শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, অন্যত্রও রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে অন্যত্র থাকলেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে কেন ? অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার বহু নজির এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য। যে কোনোরকম আধিপত্যবাদ এখানে প্রতিরোধের মুখে পড়ার কথা। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে কর্তৃপক্ষের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত সহ বিভিন্ন ঘটনায় ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলন করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সকলকে এড়িয়ে বা চুপ করিয়ে রেখে র‍্যাগিং-এর মতো নিন্দনীয় ঘৃণ্য ঘটনা এতদিন চললো কী করে তার উত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলকেই খুঁজতে হবে। শুধুমাত্র কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে কাঠগড়ায় তুলে নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেললে অন্যায় হবে।

পুলিশের তদন্ত চলছে। ফাইনাল চার্জশীট এখনও জমা পড়ে নি। ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে ঘটনা পরবর্তী সময়ে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে। পুলিশের অন্তর্বর্তী বয়ানে র‍্যাগিং-এর অভিযোগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। প্রত্যেকের আত্মপক্ষ সমর্থনের যথাযথ সুযোগ পাওয়া দরকার। আদালতে নিরপেক্ষ বিচারের পর দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া দরকার। সংশোধনের লক্ষ্যে। এদের কেউ হয়তো অপরাধ করেছে , কিন্তু কেউই দাগি অপরাধী নয়। নিজেদের সংশোধিত করে দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে উঠার সম্ভাবনাও রয়েছে। কোনও নিরপরাধী যাতে শাস্তি না-পায় তা নিশ্চিত করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়-এর তৈরী করা তদন্ত কমিটি অন্তর্বর্তী উপাচার্য'র কাছে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। র‍্যাগিং এর ঘটনাকে মৃত্যুর কারণ হিসাবে সিদ্ধান্ত করে এর সাথে যুক্ত ছাত্রদের চিহ্নিত করে শাস্তির নিদান দিয়েছেন। কাউকে পূর্ণ বহিস্কার, কাউকে ১ সেমেষ্টার, কাউকে ২ সেমেষ্টার, কাউকে ৪ সেমেষ্টার বহিষ্কারের শাস্তি দিয়েছেন। ৬ জন প্রাক্তনীর নামে এফ আই আর করার এবং হোস্টেল থেকে ২৫ জন আবাসিক-কে বহিষ্কারের রায় দিয়েছেন। যারা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের বক্তব্য শোনা হয়েছে কী-না জানা নেই, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের তদন্ত হয়েছে কিনা তাও জানা নেই। এই রিপোর্ট ও নিদান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কী সিদ্ধান্ত হয়, সেটা এখনো অজানা।

যাদবপুরে হোষ্টেলে ছাত্র মৃত্যুর পর চারিদিকে শোরগোল পড়ে গেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, UGC ,রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর, শিশু ও মহিলা সুরক্ষা কমিশন, সব রাজনৈতিক দল, সংগঠন, মিডিয়া প্রত্যেকেই সরব হয়েছে। কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মৃত্যু, বিশেষ করে ছাত্রের মৃত্যু তাও আবার র‍্যাগিং এর কারণে। প্রতিক্রিয়া হওয়াটাই স্বাভাবিক। র‍্যাগিং বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিবাদ অবশ্যই হওয়া দরকার। এর সাথে যুক্তদের শাস্তি এবং এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিথিল ও ব্যর্থ ভূমিকা সংশোধনের দাবি উঠাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনার পর চারদিকে যা ঘটতে শুরু করলো তাকে র‍্যাগিং এর বিরুদ্ধে লড়াই না বলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে লড়াই বলা উচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস দখল করার পরিকল্পনা করলো। একটি রাজনৈতিক দলের মিছিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে জুতো দেখানো হলো। প্রচার শুরু হলো,

সমস্ত বিষয়ে যাদবপুরের নিন্দা করা। কিছু মিডিয়া দায়িত্ব নিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস শুধু নেশা-ভাঙ করে স্বেছাচারিতা করার জায়গা এটা প্রমাণ করার।

বামপন্থী ভাবনা'র ঘাঁটি যাদবপুর তাই বামপন্থীরাই যত নষ্টের মূল তাই র‍্যাগিং এর বিরুদ্ধে লড়াই কারও কারও কাছে বামপন্থা উৎপাটন ও দক্ষিণপন্থা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পরিণত হলো। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে তার অতীত সহ পুরো বর্তমানটাকেই কলঙ্কজনক বলে দেগে দেওয়া হলো। তিনটি জনস্বার্থ মামলা হলো, যার একটাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি বলে NIA এর হাতে তুলে দেওয়ার দাবি করা হলো। UGC, শিশু ও মহিলা সুরক্ষা কমিশন, শিক্ষা দপ্তরের তদন্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এলো , কৈফিয়ত চাইলো। কয়েকদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মিডিয়ার লোকেদের মুক্তাঞ্চল হয়ে গেলো। ক্লাস রুম থেকে হোস্টেলের ভিতর সর্বত্র অনুমতি ছাড়াই দাপিয়ে বেড়ালো। যে কোনও ছাত্র-ছাত্রী যখন তখন মিডিয়ার আক্রমণাত্মক প্রশ্নের সামনে পড়তে লাগলো। বহু ছাত্র মেইন হোস্টেল থেকে ক্লাসে আসা বন্ধ রাখলো। বহু ছাত্র চাপ নিতে না-পারায় বাড়ি চলে গেলো। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে পাল্টে দেওয়ার চাপ তৈরী করা হলো। অথচ একই সময়ে খড়্গপুরে র‍্যাগিং-এ ছাত্র মৃত্যু ও তার পরবর্তী সময়ে কর্তৃপক্ষ, পুলিশের যোগসাজশে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা নিয়ে তেমন কিছু হলো না। বোঝা যাচ্ছে সরকার, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল, মিডিয়ার একাংশ, সমাজের কিছু মানুষ বিশেষত যারা ক্ষমতাসিনদের সমর্থক এমন অনেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বাড়তি কোনো বিদ্বেষ আছে। র‍্যাগিং-এর ঘটনায় কাঠগড়ায় দাঁড়ানো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নিজেদের সব রাগ পুষিয়ে নিতে হবে। নিজেদের এজেন্ডা এই সময়ে পূরণ করে নিতে হবে। ক্যাম্পাস দখল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের আত্মবিশ্বাস গুড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু কেন এই বিদ্বেষ? বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বিভিন্ন অংশের সাথে কথা বলে এ বিষয়ে একটা অনুমান করা যায়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্য প্রতিষ্ঠান। এর খরচ বহন করে রাজ্য সরকার। বেতন দেওয়া ছাড়া সাধারণ দৈনন্দিন খরচের জন্য কিছু বরাদ্দ হয়। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষ প্রকল্প খাতে বিশেষ অনুদান পাওয়া যায়। গত ৫ বছর তাও বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প কিছু আয় হয়। মূলত বিভিন্ন প্রজেক্ট ও কন্সালটেন্সি থেকে। পরিকল্পনা করে আধুনিকীকরণ করা যাচ্ছে না। পরিকাঠামো র উন্নতি এমন কি মেইনটেনেন্স করাও কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়কে ফান্ড দেওয়া নিয়ে দায়িত্ব নেওয়া নয়, বরং কে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করবে তাই নিয়ে রাজভবন (আচার্য) ও রাজ্য সরকারের প্রতিযোগিতা চলছে। গত বারো বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের statute তৈরী হচ্ছে। বিভিন্ন স্ট্যাটুটরি কমিটি গুলিতে নির্বাচিত শিক্ষক বা অন্যদের প্রতিনিধি পাঠানোর প্রক্রিয়া বন্ধ । উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত UGC র বিধি ভাঙা করে রাজ্য সরকার নিত্য নতুন নীতি তৈরী করছে আর রাজ্যপাল তথা আচার্য তার উত্তরে নিজের খেয়াল খুশিমত উপাচার্য্য নিয়োগ করছেন। সব মিলিয়ে প্রশাসনিক অচলাবস্থা।

বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতি হলো কারখানা হোক, অটো ইউনিয়ন হোক কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্র শাসক দল নিদেন পক্ষে প্রতিষ্ঠিত কোনো রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে চলবে। এটাই স্বাভাবিক। এর অন্যথা হলে সেটা অস্বাভাবিক। সেটা চক্রান্তমূলক। হটকারী। বিশৃঙ্খলা। বিদ্রোহী। শাসক দলের কাছে এটা নিদারুন হেরে যাওয়া। আর এটাই যাদবপুরে গত ৪২ বছর ধরে চলে আসছে। কোনও আমলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে একচ্ছত্র ভাবে শাসক দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। না ছাত্ররা, না শিক্ষক বা কর্মচারী। এমন কী ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি তে প্রতিষ্ঠিত কোনও বড় দলের নিয়ন্ত্রণ নেই। চারিদিকে চাপা সন্ত্রাসের আবহাওয়ার মধ্যে কিছুটা হলেও মুক্ত ও ক্ষমতাধরের নিয়ন্ত্রণহীন থাকার সুযোগ। নিজের মত, নিজের মতো করে বলতে পারার একটা স্পেস। সবরকমের রাজনৈতিক মতামত প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের সাথে সাথে সহাবস্থান। ব্যক্তির স্বাধীনতা আর সামাজিক দায়িত্ববোধ নিয়ে বিরোধ হয়েছে ভিতরে বিভিন্ন অংশের মধ্যে। মিটেও গেছে সকলের অংশগ্রহণে। ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন করতে গিয়ে কখনও কখনও এক্তিয়ারের বাইরে দাবি তুলেছে, কখনও গণতান্ত্রিকতার গন্ডি অতিক্রম করেছে, সমালোচিত হয়েছে। এভাবেই একটা বিশেষ পরিবেশ যাদবপুরে চলছে। এই পরিবেশ শুধুমাত্র সক্রিয় ও রাজনৈতিকমনস্কদের কাছেই নয় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক কর্মচারীদের কাছেও কাঙ্খিত। তাদের নীরব সমর্থন ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শাসক দল বা প্রতিষ্ঠিত শক্তির কাছে এই স্বাধীন থাকার ইচ্ছা ও চেষ্টা কখনোই কাঙ্খিত নয়। এটা তাদের অশ্বমেধের ঘোড়া আটকে দেওয়া। তাই সবসময় চেষ্টা চলেছে যাদবপুরকে নিজেদের দখলে আনার। কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের মতাদর্শ বারবার যাদবপুরে সমালোচিত হয়েছে। তাই বাড়তি দ্বেষ। এখন সব হিসাব সবাই মেটাতে চাইছে। যেটা বিপজ্জনক।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বদলে ডিরেক্টর বা উপাচার্য কেন্দ্রিক এবং মূলত সরকারের আজ্ঞাবহ হিসাবে পরিচালন ব্যবস্থা চলে। কিন্তু যাদবপুরে বিভিন্ন স্ট্যাটুটরি কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের মতামত নিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উপাচার্য বা কমিটি উপর থেকে নির্দেশ জারি করে কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় না। সি সি TV হোক কিংবা একাডেমিক কোনো গুরুতর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব পক্ষের মত নেওয়ার একটা চল আছে। এতে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলেও সিদ্ধান্ত রূপায়ণে সকালের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। এর সুফল-কুফল দুই নিয়েই যাদবপুর এতদিন চলছে। এই অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র এখানকার অভ্যাস। কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পথে এই অভ্যাস বিষম বাধা। এটাও ক্ষমতাধরদের কাছে পীড়াদায়ক। অতএব, মুছে ফেলা দরকার।

আর্থিক ও প্রশাসনিক দুরাবস্থা সত্বেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার মান ধরে রাখছে। দেশের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। এর জন্য গর্বিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ ও যথেষ্ট মদত ছাড়াও নিজের চেষ্টায় ভালো ফল করাটা কারও কারও কাছে কৃতিত্ব নয় বরং অনাকাঙ্খিত ঔদ্ধত্য। ফলে, র‍্যাগিং এর ইস্যুতে চাপ দিয়ে পুরো প্রতিষ্ঠানকে কোণঠাসা করা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

আর্থিক অভাব সত্বেও উৎকর্ষতা বজায় রেখেছে, না, ছাত্র-ছাত্রীদের উপর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেয় নি। এখনও মাত্র ১০০০০ টাকায় চার বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে সব সরকার শিক্ষার বেসরকারিকরণ কিংবা বাণিজ্যিকরণের পক্ষে। তাদের কাছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় একটা বাধা। সরকারি হাসপাতাল সুনামের সাথে টিকে থাকলে বেসরকারি হাসপাতাল মার খায়। তাই যাদবপুরের স্ব- মহিমায় টিকে থাকাটা বেসরকারিকরণের পক্ষে ভালো উদাহরণ নয়। যাদবপুরকে, যাদবপুরের মতো থাকতে দেওয়া যাবে না। তাই এত আক্রমণ।

র‍্যাগিং নির্মূল করার জন্য সবরকম লড়াই হোক কিন্তু এটাকে বাহানা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে সব দিক দিয়ে আক্রমণ করে ধ্বংস করার কোনোরকম চক্রান্ত মেনে নেওয়া যাবে না।

২য় পাতার পর—

মর্মান্তিক!

এই অস্বাভাবিক মর্মান্তিক আত্মহননের জন্য কে, কারা, কতটা, কোথায় কীভাবে দায়ী নাকি এর জন্য একমাত্র দায় ঐ হতভাগ্য কিশোরটির ওপরই পড়বে এ নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকরা যে বিশ্লেষণই হাজির করুন, আমরা এটাকে প্রাতিষ্ঠানিক হত্যাই বলব। এবং এখন সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সরকারি বেসরকারি নির্বিশেষে তথাকথিত 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট'-এর নামে শিশু বয়স থেকেই যে স্কুলের বাচ্চাদের হাতে কোথাও ডোনেশন বিল কোথাও লটারি নামক জুয়াখেলার টিকিট ধরিয়ে দেওয়া ও সম্ভব অসম্ভব যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য চাপ এমনকী নিপীড়ন করার যে ''Taken for granted'' রীতি চালু আছে তাতে কি এইরকম মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে না? এটাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা নাম দেওয়াটা কী খুব অসমীচিন হবে যার সঙ্গে বুঝে বা না বুঝে আমরা অনেকেই জড়িয়ে থাকি বা আছি?

এই প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সতের বছরের কিশোরটির ragging-এর বলি হয়ে অপমৃত্যুর কথা অবশ্যই মনে পড়বে। ধরে নিচ্ছি ঐ ঘটনায় যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে শান্তি ও অশান্তিপূর্ণ যা যা করেছেন ও এখনো করে চলেছেন তারা কোন রাজনৈতিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্য দ্বারা মোটেই চালিত নন। একমাত্র ছাত্রটির মৃত্যুতে সমবেদনা ও মর্মযন্ত্রণা থেকেই তারা ওখানে ছাত্রসংগঠন খুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে ''গোলি মারো----কো'' স্লোগান পর্যন্ত দিচ্ছেন তাঁরা সবাই মিলেই দার্জিলিঙের ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাপে আত্মঘাতী ছাত্রটির অপমৃত্যুর জন্য যারা যারা দায়ী তাদের প্রত্যেকের কঠোরতম সাজার দাবিতে সোচ্চার হবেন তো? ভবিষ্যতে আর কোন প্রতিষ্ঠান কখনোই ওপর অর্থসংগ্রহে কোনরকম চাপ সৃষ্টি করবে না এবং এই ''অর্থনৈতিক কারণে'' কোন ছাত্র আর স্কুলে না যেতে চাইবে না, এমন অবস্থা তৈরির জন্য জনমত তৈরি করবেন তো?

তথ্যসূত্র: THE TELEGRAPH, 3rd September, Sunday

স্মরণ

ডাঃ স্থবির দাশগুপ্ত'র জীবনাবসান

জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক, দরদী চিকিৎসক, চিন্তাবিদ ও অধিকার আন্দোলনের এবং এপিডিআর-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী-উপদেষ্টা ডাঃ স্থবির দাশগুপ্ত'র জীবনাবসান হয়েছে ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

ক্যান্সার চিকিৎসায় স্থবির দাশগুপ্ত স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন। ক্যান্সার চিকিৎসা নিয়ে কর্পোরেটে যে নিছক ব্যবসা চালাচ্ছে, এ-কথা তিনি তাঁর চিকিৎসক উপলব্ধি দিয়ে যেমন নিজে বুঝেছিলেন, তেমনি জীবনব্যাপী মানুষকে এ-কথা তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি চিকিৎসা যেমন করেছেন, বেশ কিছু বইও তিনি রচনা করেছেন। সেইসব রচনাগুলি ছিল যথেষ্ট সাহিত্যগুণসম্পন্ন।

স্থবির দাশগুপ্তকে বিশেষত আমরা মনে রাখবো— ২০২০ সালের করোনা-লকডাউনের সময় পর্যায়ে যে কজন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, গবেষক, সমাজকর্মী করোনা অতিমারী এবং লকডাউন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, স্থবির দাশগুপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এপিডিআর-ও সেইসময় লকডাউনের বিরুদ্ধে কর্মসূচী নিয়েছিল। এইসময় করোনার এবং লকডাউনের বিরোধিতা করেছিল যে সমস্ত মানুষ, সংগঠন তাদের বহু ব্যঙ্গ এবং উষ্মা সহ্য করতে হয়েছিল। স্থবির দাশগুপ্ত একটু বেশিই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন উঠেছিল করোনা ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে। ডাঃ স্থবির দাশগুপ্ত করোনা ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন।

করোনা ভ্যাকসিন নেওয়া-না-নেওয়া নিয়ে মানুষের সিদ্ধান্তের অধিকার বিষয়টিকে এপিডিআর যেমন বলেছে, তেমনি ডাঃ স্থবির দাশগুপ্তও এই বাধ্যতার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।

স্থবির দাশগুপ্ত'র জীবনাবসানে ক্ষতি হল, ক্যান্সার নিয়ে কর্পোরেটের ব্যবসার বিরুদ্ধে আন্দোলনের, ক্ষতি হল, সাহিত্যগুণ সম্পন্ন চিকিৎসা নিয়ে লেখার জগতে এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের।

অধিকারকর্মী শ্রীকৃষ্ণ পালের জীবনাবসান

বাঁশবেড়িয়া-ত্রিবেণী শাখার প্রাক্তন অকুতোভয় সদস্য এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আন্দোলনের লড়াকু সাথী-কর্মী কৃষ্ণা'দার (শ্রীকৃষ্ণ পাল) গত ১৫ই জুলাই, ২০২৩ জীবনাবসান হয়েছে।

যুবক বয়স থেকেই মানুষের বঞ্চনা এবং অধিকারহীনতার ঘটনা বাঁশবেড়িয়া-ত্রিবেণী অঞ্চলে যেখানেই ঘটেছে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কোন দল অথবা দুস্কৃতীর হুমকীকেও অগ্রাহ্য করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। ডানলপের যে সময় চালু ছিল সেই সময়েও শ্রমিকের অধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এমনকি ডানলপ কারখানা যখন বন্ধ হয়ে যায়, সেসময়ও মৃত্যুর পূর্বেও শ্রমিকের গ্র্যাচুইটি এবং পি.এফ. পাওনার জন্য আন্দোলন যেমন করেছে, আইনের সাহায্য নিয়েও শ্রমিকের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা ২০০৬ সালে যখন নাগরিকদের জল-কর দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, সেইসময় জল-করের বিরুদ্ধে এপিডিআর-এর আন্দোলনের একদম সামনের সারিতেই শ্রীকৃষ্ণ পাল ছিলেন।

বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলের একটি পুকুর বোজানোকে কেন্দ্র করে এলাকার দুস্কৃতীদের ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী হুমকিও অগ্রাহ্য করে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। কোনও অধিকারের ক্ষেত্রে কেউ পাশে না থাকলেও তিনি একাই প্রতিবাদ এবং আইনের সাহায্য নিতে পিছিয়ে যাননি। মামলায় এই বোজানো পুকুরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হাইকোর্ট রায় দেয়। লোকাল প্রশাসন সেই কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়নি। উপরন্তু এলাকার দুস্কৃতীদের ভয়ানক আক্রমণের মুখে পড়েন।

ত্রিবেণী-বাঁশবেড়িয়া শাখার উদ্যোগে ২৯শে জুলাই, ২০২৩, শনিবার, তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণাদার মৃত্যুহীন প্রাণকে, তাঁর করে যাওয়া কাজের স্মৃতিচারণায় ঐদিন শ্রদ্ধা-ভালোবাসা জানানোর সভায় জেলার অধিকার কর্মীরা এবং কৃষ্ণাদার পরিজনরাও উপস্থিত ছিলেন বাঁশবেড়িয়ার সন্তান সংঘ ভবনে।